সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—৫৩

তীর্থ-ভ্রমণ

৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত

তাঁহার ভ্রমণের রোজনামচা

—*—

টীকা-টিপ্পনী ও সবিস্তার মুখবন্ধ সহ

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সিদ্ধান্তবারিধি-সম্পাদিত

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

১৩২২
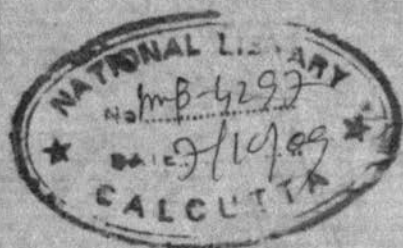
Printed by
R. C. Mittra, at the Visvakosha-Press
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA.

ত্রি.

To

His Excellency

The Right Hon'ble Thomas David Gibson

BARON CARMICHAEL OF

Skirling, G. C. I. E., K. C. M. G., M. A.

The Tirtha-Bhramana

Written by an illustrious

Bengali of the 19th Century

IS

most respectfully dedicated

by the Editor

as a token of his loyal devotion

and admiration

for His Excellency's great interest in the

cause of the

Bengali Literature.

৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

তীর্থ-ভ্রমণের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

তীর্থ-ভ্রমণ বঙ্গভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এ প্রকার গ্রন্থ তৎপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় আর লিখিত হইয়াছিল কিনা জানি না। আমাদের কোন প্রবীণ সাহিত্যিক* এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানাইয়াছেন,—"বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটা নূতন ঘটনা বলিতে হইবে। কোন বাঙ্গালী বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে তীর্থ-পর্য্যটনে নির্গত হইয়া এ প্রকার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া যান নাই।" বাস্তবিক বলিতে কি, এরূপ দৈনিক-বিবরণ বা রোজ-নামচা লিখিবার পদ্ধতি আমরা মনে করিতাম যে, ইংরাজী প্রভাবের ফল—এখনকার জিনিস। কিন্তু এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমাদের সেই ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। তাই এই তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হইতেছি।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুল-গৌরব স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই তীর্থ-ভ্রমণের রচয়িতা। সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাস হইতে ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় চারিবর্ষের ভ্রমণ-কাহিনী ও তাঁহার জীবন-ঘটনা লইয়া গ্রন্থকার এই তীর্থ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইয়াছে, সে সময়ের এখনকার মত দূরদেশ-যাত্রা সহজসাধ্য ছিল না, তখনও এখনকার মত রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। অথবা বিজয়রাম বিশারদের তীর্থ-মঙ্গলবর্ণিত মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ভাব

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি বা সহায়সম্পত্তি ছিল না।* অথচ তিনি পদব্রজে কত দূরদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন, কত কষ্ট সহ্য করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় বা দৃঢ় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক ও শত মুখে প্রশংসার যোগ্য। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কি কারণে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনী-প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভের আশায় গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর হন নাই, অথবা তাঁহার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ কোন দিন যে সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশিত হইবে, এরূপ আশাও তিনি কোন দিন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সন ১১৬০ সাল ১১ই ফাল্গুন তীর্থযাত্রায় বাহির হন, সেই দিন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রত্যহ যাহা দেখিয়াছেন বা যাহা করিয়াছেন, তাহা নিজের তৃপ্তির জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনকে শুনাইবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া লিখিয়া রাখেন। সময়ে সময়ে তাঁহার এই তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী প্রিয়পুত্র ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের নিকট শুনাইতেন, সকলে আত্মহারা হইয়া তাঁহার মুখে তীর্থ-বিবরণীর সঙ্গে দেশের অবস্থা, বংশের কথা ও সমাজের পরিচয় শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। শুনিয়াছি, কোন মনীষী † অনেক দিন পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থপ্রকাশের জন্য গ্রন্থকারের উপযুক্ত বংশধরদিগকে

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মৎ-সম্পাদিত তীর্থ-মঙ্গলের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন।

অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত বিস্ময়ের কথা যে, তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার এই মহামূল্য সম্পত্তি এতদিন প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের একটা আশঙ্কা ছিল—গ্রন্থকার যে ভাষায় তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হয়ত ঠিক এখনকার ভাষা নহে, সাধুভাষার অনুবর্ত্তক সাহিত্যিকগণ হয়ত তাহাতে অনেক দোষ বাহির করিতে পারেন, ইত্যাদি নানা কারণে তাঁহারা তাঁহাদের পূজার সামগ্রী বাহিরের সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত করিতে বিরত ছিলেন। গ্রন্থকারের উপযুক্ত পৌত্র (আমাদের পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি) মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের যত্নে আমাদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সুহৃদ্বর রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মূলগ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। রায়সাহেবের আগ্রহে এই গ্রন্থের একখানি নকলও প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাঁহারই নিকট সর্ব্বপ্রথম আমি এই উপাদেয় পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছিলাম। পরে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এই পুস্তক প্রকাশের পরামর্শ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে তীর্থ-ভ্রমণের কথা প্রকাশ করেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই তীর্থ-ভ্রমণ ও এই সঙ্গে তীর্থ-মঙ্গলের সম্পাদন-ভার আমার উপর অর্পণ করেন। ঈশ্বরেচ্ছায় উভয় গ্রন্থই প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থ-ভ্রমণের গ্রন্থকার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাই অতি সরল কথায় আত্মতৃপ্তির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বর্ণনায় কেবল তীর্থ-মাহাত্ম্য বলিয়া নহে, এখনকার

নানা স্থানের সমাজচিত্র, লোকচরিত্র, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইতিকথা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই স্থানলাভ করিয়াছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে সময়ে গ্রন্থ রচনা করেন, সে সময়ে এ দেশে ভাল গদ্যগ্রন্থ বেশী প্রচলিত হয় নাই, তখনও সাধারণে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায় পদ্যগ্রন্থেরই বেশী আদর করিতেন, তৎকালে প্রসাদগুণবিশিষ্ট সুললিত গদ্যে রচিত অল্প গ্রন্থই প্রচারিত ছিল। এ হেন সময়ে সাহিত্যিক হইবার বাসনাশূন্য-হৃদয়ে তিনি যেরূপ ভাষার সারল্য, রচনা-নৈপুণ্য, লিপি-কুশলতা ও মনের ভাব প্রকাশে সফলতা দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা!

গ্রন্থ-পরিচয়

তাঁহার এই বৃহৎ গ্রন্থে বিশেষভাবে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের কোন্ কোন্ বিষয় অবশ্যজ্ঞাতব্য, তাঁহার বর্ণনায় কিরূপ হৃদয়ের ভাষা ব্যক্ত হইয়াছে, এই পরিচয়-প্রসঙ্গে তাহার একটা সমালোচনা প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া আমাদের গ্রন্থকার ১২৬০ সালে ২০এ ফাল্গুন প্রথম বালসীর লক্ষ্মীনারায়ণ-শিলা দর্শন করিলেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"দর্শন পাওয়া দুষ্কর, পয়সা লইয়া কৃত্রিম শিলা দর্শন করায়। পূজারি যে ব্রাহ্মণ আছে অতি দুর্দ্দান্ত। যে সব যাত্রী ছিল, ... তাহারা ঐ ঠাকুরের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পূজারিকে আলাহিদা পয়সা গোপনে দিয়া যথার্থ মূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে দাঁড়াইয়া থাকিল। পূজারি পাষণ্ড, শপথ ... য়া অনেক চাতুরী করিয়া অল্প দর্শন গোপনে করাইল। সকলে

বিশ্বাস করিয়া দর্শনান্তরে স্নান-জলাদি ধারণ এবং যে যাহা দিবে, তাহা দিয়া আইল।" কিন্তু ভক্ত গ্রন্থকার সেই পূজারির চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকের দ্বারের নিকট ছদ্মবেশে রহিলেন। "যথায় পূজারির শ্বশুর প্রভৃতি কয়েক-জনা স্ত্রীলোক তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদিগের দর্শনার্থে সমভ্যারে লইয়া বসিয়াছিল সেই স্থানে তাহাদের সমভ্যারে রহিলাম। যে সময় তাহাদিগের দর্শন করাইল, তাহাতে যথার্থ শিলা দেখাইল, তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ-শিলার যে চিহ্ন যথাশাস্ত্র তাহা দীপ্তমান্।" এইরূপে ভক্ত প্রকৃত ভক্তির সামগ্রী দর্শন করিয়া নয়ন-মন সার্থক করিলেন।

তৎপরে তিনি (২১এ ফাল্গুন) সোণামুখী গ্রামে প্রসিদ্ধ কথক গদাধর-শিরোমণির বাসস্থান দর্শন করেন। এই গদাধর শিরোমণিই বর্ত্তমান কথকতার প্রবর্ত্তক। তৎপরে শ্রীরামপুরের ঘাট, গোপালপুর, অণ্ডাল, মধুবন, নিয়ামতপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া ২৬ ফাল্গুন মেটেসিঁদরে পাহাড়ে আসিলেন। এখানে পঞ্চকোটরাজ হরিশ্চন্দ্র শেখরের দুইটী সুন্দর মন্দির দর্শন করেন। এখান হইতে দশ ক্রোশ পশ্চিমে গোবিন্দপুরের চটীতে আসিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এই চটী অবধি মগধরাজ্য। * * এ স্থানের মনুষ্যগণ দোভাষী, আধাখোট্টা আধা-বাঙ্গালা বোল।" —সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এই উক্তি হইতে বুঝিলাম যে, তৎকালে গোবিন্দপুর হইতেই মগধ বা বেহারের সীমা ধরা হইত, যদ্যো বাঙ্গালার সামিল হইলেও এখন এইস্থান মানভূম জেলার নগর হাইয়ারি পরগণার অন্তর্গত, বেহার গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন।

২৯ ফাল্গুন তিনি পরেশনাথ পাহাড়ে গিয়া সরাবগি বণিক্‌দিগের

কুলদেবতা সম্ভবতঃ পার্শ্বনাথ স্বামীর প্রস্তরনির্ম্মিত দিগম্বরমূর্ত্তি দর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "একজন মোহন্ত স্বরূপ জটাধারী ভস্মমাখা তথায় আছেনই, তাঁহার চেলা সকল সরাবগির বণিক্।" আমরা সাধারণতঃ জানিতাম যে, সরাবগি বা জৈন-শ্রাবকদিগের গুরু বা যতিগণের স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ, স্বতন্ত্র বেশভূষা, কখন শৈব মোহান্তদিগের মত জটা বা ভস্ম ধারণ করেন না, কিন্তু এই গ্রন্থ হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, চারিদিকে শৈব, শাক্ত প্রভৃতি হিন্দুদিগের মধ্যে থাকিয়া জৈন যতিগণও কতকটা শৈব-মোহান্ত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৬ই চৈত্র গ্রন্থকার বোধগয়ায় আসেন। "এখানে গয়াসুর বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন, এই স্থানে জয়-পরাজয় হয়।" এ ছাড়া তিনি এই প্রসিদ্ধ স্থানের আর কিছু পরিচয় দেন নাই। এমন কি খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুকানন হামিলটন্ এই স্থান দর্শন করিয়া মহাবোধির ধ্বংসাবশেষকে 'রাজস্থান' বা একটী 'গড়' নামে উল্লেখ করিয়াছেন! যেখানে ভগবান্ শাক্যবুদ্ধ মহাবোধি লাভ করেন, বৌদ্ধজগতে যেস্থান সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পূজিত, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গ্রন্থ-রচনাকালে সেই মহা-পুণ্যক্ষেত্রের অতীত স্মৃতি সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন এখানে মোহান্ত ও তাঁহার চেলা নাগাদিগের প্রাধান্য। শুভক্ষণে এই মহাবোধির ধ্বংসাবশেষের প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক কনিংহাম সাহেবের শুভদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। তিনিই প্রথম এখানকার বৌদ্ধ-কীর্ত্তি উদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সরকার বাহাদুরের অর্থে কনিংহাম এখানকার খনন-কার্য্য আরম্ভ করিলেন, অল্পদিন মধ্যেই ভূমধ্য হইতে বোধগয়ার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মহাবোধি-মন্দিরের সংস্কার করাইবার জন্য তিন জন কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম হইলে ছোটলাট সর আস্‌লি এডেন প্রথমে জে, ডি, বেগলার ও পরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়কে কার্য্য-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের যত্নে ও ব্রহ্মরাজের উদ্যোগে মহাবোধি-মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সময়ে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই হইল। এখন বোধগয়া সমগ্র সভ্য-জগতের দ্রষ্টব্য স্থান। বোধগয়ায় অদ্যাবধি সেই পূর্ব্বতন মোহান্তের গদী ও তাঁহার উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান।

বোধগয়া হইয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় গয়াধামে গমন করেন। গয়াধামে সেজুয়া ও গয়ালেরা যাত্রীর উপর কিরূপ কর আদায় করেন,—গয়ায় গিয়া কি ভাবে তীর্থকৃত্য করিতে হয়,—গয়ায় কোন্ কোন্ স্থান দ্রষ্টব্য ও কোন কোন্ মহাত্মার কীর্ত্তি আছে, তাহা পরে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গয়াকৃত্য সারিয়া যমুনা গ্রাম, পড়োড়ি, সাসেরাম, জাহানাবাদ, মোহনিয়া, কর্ম্মনাশা, জগদীশের সরাই ও দুলাইপুর হইয়া কাশীধামে আগমন করেন। গয়া হইতে কাশীধামে পদব্রজে আসিতে তাঁহার ৮ দিন লাগিয়াছিল। তিনি ১২৬০ সালের ৩১এ চৈত্র হইতে ১২৬১ সালের ১২ই বৈশাখ পর্য্যন্ত এবং তৎপরে প্রত্যাগমনকালে ১২৬৩ সালে ১৭ই পৌষ হইতে ১২৬৪ সালের ১৩ই আশ্বিন পর্য্যন্ত কাশীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কাশীবাসের কারণ তিনি এখানকার নানা তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অনেক মহাত্মাই

আমাদের সর্ব্বপ্রধান মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের ভক্ত তীর্থ-ভ্রমণকার সংক্ষেপে হইলেও যে ভাবে কাশীর পঞ্চক্রোশীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক আর কাহারও গ্রন্থে আমরা সেরূপ পরিচয় পাই নাই। যাঁহার কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বরের আরতি-দর্শনের সুবিধা হয় নাই, তিনি এই তীর্থ-ভ্রমণে তাহার উজ্জ্বল চিত্র পাইবেন। গ্রন্থকার আরতির বর্ণনা শেষ করিয়া লিখিয়াছেন, "চতুষ্পার্শ্বে সকলে দাঁড়াইয়া ঐ সকল বাদ্যধ্বনি, স্তুতিপাঠ, চামর, মোরছল, আড়ানি ইত্যাদির ব্যজনে কি চমৎকার দেখিতে হয়, তাহা কি কহিব! যে দেখিয়াছে, সেই জানিতে পারিবে!"

১২৬১ সালের ১২ই বৈশাখ কাশী হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মেড়ুয়াডিহি, জাম্সোয়াদ, গোপীগঞ্জ, বেণি, হনুমানগঞ্জ ও ঝুসী হইয়া ১৭ই বৈশাখ প্রয়াগে আগমন করেন। প্রয়াগে পদার্পণ করিয়াই তিনি প্রয়াগীদিগের দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া লিখিয়াছেন, "প্রয়াগীদিগের সৈন্য আছে। প্রয়াগীসকল অতিশয় ধনগ্রাহী, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। প্রথম যাত্রী আনিবার সময় অতিশয় শিষ্ট! আপন দুর্গে প্রবেশ করাইতে পারিলে দুষ্টতার শেষ।" (৪৭ পৃঃ) কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রয়াগে আসিয়া তিনি এই প্রয়াগীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"প্রয়াগী যাত্রীদিগের প্রতি যেমত দৌরাত্ম্য করে, তাহা গতবারে চক্ষুতে দেখিয়া জ্ঞানহত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রয়াগীদিগের চরিত্র সত্যযুগের ব্রাহ্মণের ন্যায়। প্রয়াগীদিগের অনুষ্ঠান ভাল আছে। সন্ধ্যাহ্নিক পুরাণ-গীতাদি পাঠ করিয়া থাকে! বেণীমাধবের জয়!" (৬২৮ পৃঃ)

প্রথমবার ১৭ই বৈশাখ হইতে ২০এ বৈশাখ পর্য্যন্ত এবং

তৎপরে প্রত্যাগমনকালে ১২৬৩ সালে ৭ই পৌষ হইতে ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত গ্রন্থকার প্রয়াগে অবস্থান করেন। তাঁহার অক্ষয়-বটের বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী—"কাম্যকূপের তীরে অক্ষয়বট। ঐ বটবৃক্ষ অদ্যাবধি জীবৎমান আছে, তাহার উপরে গাঁথিয়া ঘর করিয়াছে। রৌদ্র-বাতাস কি বৃষ্টি কিছু পায় না, তথাচ প্রতি বৎসর চারি পাঁচ গাড়ী ডাল কাটিয়া ফেলিতেছে। কেল্লার প্রায় কুড়ি হাত নিয়ে অন্ধকার ভূমি মধ্যে বটবৃক্ষ আছে, বিনা আলোর তথায় যাইবার ক্ষমতা হয় না। ঐ স্থানে দুই বৃক্ষ, এক বৃক্ষ সম্মুখে আছে, কিঞ্চিৎ অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই দেখা যায়। কিন্তু ঐ বট আসল অক্ষয়বট নহে। আসল অক্ষয়বট তাহার পর কুড়ি হাত নীচে যাইলে দর্শন হয়, বক্রভাবে আছে।" (৪২৬ পৃঃ)

আজকাল ইংরাজ বাহাদুর যে ভাবে অক্ষয়বটের উপর গাঁথিয়া আলো যাইবার পথ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে দিবসে যাত্রিগণের স্বতন্ত্র আলোকের বড় প্রয়োজন হয় না। সহজেই সাধারণের অক্ষয়বট দর্শন লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আসল অক্ষয়বট দর্শন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে বলিতে পারি না।

অক্ষয়বটের পার্শ্বেই কাম্যকূপ আছে। কিরূপে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লীশ্বর হইবেন কামনা করিয়া ঐ কূপে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন, ও পরে তিনিই অকবর বাদশাহ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; পাছে কেহ তপস্যা না করিয়া সহজেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে জানিয়া ঐ কাম্যকূপে ঝাঁপ দেন, এই আশঙ্কা করিয়া দিল্লীশ্বর "পরে কাম্যকূপে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিয়া তাহার উপরে কেল্লা করিলেন।" ইত্যাদি প্রবাদমূলক আখ্যায়িকা ও প্রয়াগের মাঘমেলার কথাও গ্রন্থকার বাদ দিয়া যান নাই। প্রয়াগ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই প্রয়াগকে এলাহাবাদ কহে। অতি উত্তম সহর, অনেক ধনাঢ্য মহাজন আছে। এখানকার জলবাতাস অতি উত্তম, শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, সকল মনুষ্য বলিষ্ঠ; আহার্য্য উত্তম পরিপাক পায়। সহরে ৫১ হাজার ঘরের বসতি। প্রয়াগী ৫০০ ঘর সর্ব্বত্র আছে। মহলে মহলে এক এক বাজার আছে। তাহাতে উত্তম উত্তম খাদ্য-দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।"

২০এ বৈশাখ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রয়াগ ত্যাগ করেন। দুর্গাগঞ্জ, ইশানগঞ্জ, গোসামীপুর, ভূধরের সরাই, চৌধুরীর সরাই, কুঞ্জরপুর ও খাজুয়া হইয়া ২৮এ বৈশাখ কানপুর, তৎপরে বিঠুর ও কান্যকুব্জ দর্শন করিয়া ২৭এ বৈশাখ লখ্নৌ আসিয়া পৌঁছিলেন। কানপুর, বিঠুর, কান্যকুব্জ ও লখ্নৌ সহরের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল, তাহা দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কএক স্থান উল্লেখ-যোগ্য—

কানপুরে "প্রায় ৩০০ শত বাঙ্গালী আছেন। অনেকে স্ত্রীপুত্র-পরিবারসমেত আছেন। এক কালীবাড়ী আছে, তাহাতে অনেক অভ্যাগতের স্থান হয়।" "কানপুরের উত্তরপশ্চিম ৮ ক্রোশ বিঠোর। ইহা বাল্মীকি মুনির তপোবন, সীতার বনবাস-স্থান, লবকুশের জন্মভূমি। এক্ষণে পুণা সেতারার বাজীরাও মহা-রাষ্ট্রের বাড়ী এবং কিছু পদাতিক আছে। তাঁহার দত্তকপুত্রের পুত্র নানাসাহেব।"

"বিঠোর হইতে কান্যকুব্জ ৬ ক্রোশ। ঐ স্থানে কনৌজ-ব্রাহ্মণদিগের বাস। গঙ্গার তীরে পুরাতন নগর সহরতুল্য। এই কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গৌড়রাজ্যে আইসেন। তাহাতে আমরাও আছি। অনেক পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত

আছেন। বেদাধ্যায়ী সকলে প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্বান্। অনেক দেবালয় নগর মধ্যে স্থানে স্থানে পূর্ব্বকালের স্থাপিত আছে" ইত্যাদি। তখনকার লখ্নৌসহরের জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন,—"গোমতী নদীর তীরে লক্ষ্ণৌ। গোমতী গঙ্গার এক শাখা, সরযূ নদীর সহিত মিলন আছে।"

২৭এ বৈশাখ হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত লখ্নৌসহরে অবস্থান করেন; তৎপরে অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী বন-জঙ্গল হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বসতি এবং রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। শ্রীরামনবমীতে মেলা হয়। রামাৎ-বৈষ্ণব আছে। পাঁচ ছয় হাজার বৈষ্ণব শ্রীরামের জন্মভূমি এবং হনুমান-গড়ীতে আছে, সর্ব্বদা জ্ঞানসাধনে উন্মত্ত। ... ... যে স্থানে রামচন্দ্রের জন্মভূমি, ঐ দ্বারে এক বৃহৎ হনুমান আছে, তাহাকে কিছু খাদ্য-দ্রব্য না দিলে পথ ছাড়িয়া দেয় না। যে স্থানে রাজ-সিংহাসন ছিল, উচ্চ দ্বীপের ন্যায় হইয়া আছে। রাজধানী প্রায় দশক্রোশ পর্য্যন্ত ছিল। বাড়ী-ঘরের চিহ্ন পাথর এবং ইটসকল স্থানে স্থানে আছে।"

৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রন্থকার মিথিলা ও নৈমিষারণ্যে ভ্রমণ করেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, অপরাপর স্থান-সম্বন্ধে তিনি যেমন বিশদ বর্ণনা করিয়া উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, মিথিলা-সম্বন্ধে সেরূপ কিছু বলিয়া যান নাই। ভারতের অতি প্রাচীন কালের জ্ঞান-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র বিদ্যাপীঠ মিথিলা-সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। নৈমিষারণ্য-সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু না বলিয়া এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছেন, "যথায় ষাটী সহস্র ঋষির তপোবন, অতি মনো-

হয় নির্জ্জন স্থান, অনেক সাধু সন্ত আছেন, নৈমিষারণ্যে যেমত মনের আনন্দ জন্মে, তাহা কি কহিব, নানাপুষ্পে বন সুশোভিত।"

১৬ই জ্যৈষ্ঠ অযোধ্যার পথ হইয়া সেকেন্দরায় আগমন করেন। প্রথম দর্শনকালে এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বাদসাহী মস্‌জিদের উল্লেখ করিতে ভুলিলেও প্রত্যাগমন কালে এখানকার অকবর বাদসাহের প্রসিদ্ধ সমাধি মস্‌জিদকে ভ্রমক্রমে সেকন্দর বাদসাহের মসজিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ সেকেন্দরা হইতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বেউর, একদল, বিগয়াই, মিঠেপুর, শকুয়াবাদ, ও রাজার টাল হইয়া ২১এ জ্যৈষ্ঠ উশানী গ্রামে পৌছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি আত্মীয় স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্ম সংবাদ দিয়াছেন,—"এক ক্রোশ থাকিতে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী বাউলদাস ও ঠাকুরদাস ব্রজবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের কর্ম্ম যাত্রী লইয়া যাওয়া। পথি-মধ্যে শুনিয়াছিলাম যে কাশীর কেশেল, প্রয়াগের প্রয়াগী ও বৃন্দা-বনের কুঞ্জবাসী তিন তুল্য, তাহারা যাত্রীর প্রায় ডাকাতি করিয়া অর্থ হরণ করে। বিশেষতঃ আমার মানস যে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিব। দুই তিন বৎসর থাকিতে হইবেক। এজন্ত বাউলদাসকে কহিলাম, আমি কুঞ্জবাসীর কুঞ্জে থাকিব না, আলা-হিদা বাসায় থাকিব। আর আমার সঙ্গে যে টাকা ছিল, সকল শেষ হইয়াছে।" • • • এই কথা বাউল শুনিয়া কহিল, 'মহাশয় বুঝিয়াছি, মহাশয় বুঝি শুনিয়াছেন, যে কুঞ্জবাসীরা জুয়াচোর। যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু মানুষ তাহা একবার জাত হওয়া আবশ্যক।' এই কথা বাউলদাস কহাতে ঠাকুরদাস ব্রজবাসী কহিল, যে বাউল উত্তম মানুষ, আর

তাহা একবার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।' এই কথা বাউলদাস কহাতে ঠাকুরদাস ব্রজবাসী কহিল, যে বাউল উত্তম মানুষ, আর টাকাকড়ি যাহা দরকার হইবে, তাহা পাইবে।" এইরূপে গ্রন্থকার ব্রজবাসীর মধ্যে যে হৃদয়বান্ বিশ্বাসী ভাল লোকও আছেন, ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন।

২২এ জ্যৈষ্ঠ খান্দানী হইয়া পরে ৯ ক্রোশ যাইয়া তাঁহার বলদেব দর্শন হইল। এই বলদেব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের লীলাস্থান ব্রজভূমি আরম্ভ। বলদেবের বিবরণ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "তত্র স্থাপিত চারিদেবের এক দেব প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, পাওাগণ ভীমাকৃতি—অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর।"

বলদেবে একরাত্রি বাস করিয়া তৎপরে ব্রহ্মাণ্ডঘাট, গোকুল, মহাবন, নূতন গোকুল ও মথুরা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রবেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাঁহার কিছুকাল বাস করিবার সঙ্কল্প থাকিলেও এবং বাউলদাস ব্রজবাসী তাঁহাকে স্বতন্ত্র থাকিবার ঘর 'বন্দোস্ত' করিয়া দিলেও ২৪এ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৬ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ১৩ দিনমাত্র বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্যামবাজার-নিবাসী কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাদের সহিত ৭ই আষাঢ় জয়পুর-পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন। ৮ই আষাঢ় বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা, খণ্ডা, শৌক, কুম্ভীরা সহর, হেলেনা, মৌ, বিশড়া, সেকেন্দরা, দেশা ও মোহনপুরা হইয়া ১৮ই আষাঢ় জয়পুর-ঘাট দরজায় আসিয়া অবস্থান করেন। ১৯এ আষাঢ় হইতে ২৩এ আষাঢ় ৫ দিন জয়পুরের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, দর্শন করেন। এখানে গ্রন্থকার লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা জয়পুর-রাজকন্যা, জয়পুরের দেবসেবা ও শিলাদেবীর কথা বেশ উজ্জ্বল ভাষায়

বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শিলাদেবীর কথা আমরা প্রথম ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গে পাই।—

"শিলাদেবী নামে, ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।"

কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য কিরূপে শিলাদেবী পাইয়াছিলেন, সে কথা ভারতচন্দ্র লিখিয়া যান নাই। আমাদের তীর্থভ্রমণকার জয়পুরে স্বচক্ষে শিলাদেবী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "ঐ দেবী পূর্ব্বে মথুরাতে কংসরাজার রাজস্থলে শিলারূপে ছিলেন। ঐ শিলাতে দেবকীর সন্তানদিগকে আছাড়িয়া বিনষ্ট করিত। যৎকালে যোগমায়াকে ঐ শিলার উপর আছড়াইতে গিয়াছিল, শিলা স্পর্শমাত্র দেবী অষ্টভুজা হইয়া শূন্যপথে গমন করিলেন। ঐ যে শিলা তথায় ছিল, যৎকালে প্রতাপাদিত্য যশোরনগর হইতে এতদ্দেশে আসিয়া ছিলেন, ঐ প্রস্তরে এক দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া স্বদেশে লইয়া যান। যশোর-নগরে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকিতেন। দেবীর কৃপায় কেহ রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে পারিত না। যৎকালে মানসিংহ বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে আসেন, তৎকালে বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়া দেবীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া জয়পুরে ঐ পাহাড়ের উপর স্থাপিত করিলেন। দেবীর নিকট প্রতিদিন মেষ মহিষ ছাগ নরবলি দিয়া পূজা করিতেন। এইমত বলি প্রদান করাতে শিলাদেবী সাক্ষাৎ হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। পরে রাজা সওয়ায় জয়সিংহ নরবলি নিষেধ করিয়া ছাগলাদি বলি দিতেন, তাহাতে দেবী রুষ্ট হইয়া বামদিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন। এ পর্যন্ত ঐরূপ দেবী মুখ ফিরাইয়া আছেন দৃষ্ট হয়। অতি

উত্তম মূর্ত্তি, অষ্টভুজা দেবী, সুগঠন, দর্শনে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।"

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বচক্ষে শিলাদেবী দর্শন করিয়া রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রেরই সমর্থন করিয়াছেন, অথচ যশোর-খুলনার ইতিহাসলেখক প্রমাণ করিতে চান যে, যশোরেশ্বরী-মূর্ত্তি মলই পরগণার অন্তর্গত কপিলমুনি নামক স্থানে বিরাজ করিতেছেন।*

আমাদের গ্রন্থকার সদলে ২৪এ আষাঢ় জয়পুর ত্যাগ করিয়া বকড়ু, পাড়ু ও বাঁদরসিন্দরি হইয়া ২৭এ আষাঢ় কৃষ্ণগড় আগমন করেন। কৃষ্ণগড় সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বাঁদরসিন্দরি হইতে দশ ক্রোশ কৃষ্ণগড়, পাহাড়ের উপর সহর। কৃষ্ণগড়ের রাজা স্বাধীন, যোধপুরের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র, রাজধানী অতি উত্তম। বৃদ্ধ রাজা বড় ধার্ম্মিক, পীড়ক নহেন—পালক। রাজ্যের শৃঙ্খলা ভাল আছে। ঘৃতপক্ক ভিন্ন তৈলপক্ক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার অনুমতি নাই। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, সংক্রান্তি, রবিবার এই কয় দিবসে ঘৃতের কড়াই জ্বালাইবার অনুমতি নাই। রাজ্যের মধ্যে পর্ব্বত কি ময়দান ইত্যাদি যাহাতে ভয়ানক পথ আছে, তাহাতে ভালমতে রক্ষকগণ নিযুক্ত আছে। অর্দ্ধক্রোশ অন্তর অন্তর এক এক থানা, তাহাতে জমাদার একজনা ও দশ সওয়ার প্রতি খাটিতে আছে। এই মত রাজ্যরক্ষা এবং পথিকগণের হিত করিতেছেন। কোনক্রমে কাহারও অপচয় না হয়। * * দধি যেমন উত্তম ঐ স্থানে মিলে, এমন দধি মথুরা ব্যতীত কোথাও দেখি নাই।" ইত্যাদি।

---

* শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র রচিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৪৪-১৬০ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বকালে আদর্শ হিন্দুরাজগণ কিরূপে প্রজাপালন ও ধর্ম্মভাবে রাজ্যরক্ষা করিতেন, ক্ষুদ্র কৃষ্ণগড়-প্রসঙ্গে আমরা তাহারই ক্ষীণ স্মৃতি পাইতেছি।

তৎপরে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বাণনদী ও কাউড়ি হইয়া বুড়া-পুষ্করে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুষ্কর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পুষ্করতীর্থ সকল তীর্থের গুরু। এই স্থানে তিন পুষ্কর—বুড়াপুষ্কর, মধ্যপুষ্কর, কনিষ্ঠপুষ্কর। বুড়াপুষ্কর শিবের যজ্ঞভূমি, মধ্যপুষ্কর বিষ্ণুর যজ্ঞভূমি, কনিষ্ঠপুষ্কর ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি। যথায় ব্রহ্মা বসিয়া যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন, ঐ কুণ্ডের নাম ব্রহ্মপুষ্কর। ঐ কুণ্ডের পরিক্রম করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রম দিতে হয়। এত বড় বৃহৎ কুণ্ড দীর্ঘ প্রস্থ প্রায় সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। এই কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে দেবালয় এবং বসতাদি হইয়া সুশোভিত আছে। কুণ্ডের জল সুশীতল, সুনির্ম্মল, অগাধ জল। কমলের বন শ্বেত শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া কুণ্ডের শোভাজনক। জলজন্তু মকর কুম্ভীর ইত্যাদি নানাজাতীয় আছে। মৎস্য নানাজাতি, তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। হংস বক প্রভৃতি আর আর জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা জলকেলি করিয়া কমল-কুমুদ-মৃণ ভক্ষণে সুখী হইয়া বিহারাদি করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।" ইত্যাদি ভাবে পুষ্করতীর্থের উৎপত্তি, মাহাত্ম্য ও আখ্যায়িকা সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই পুষ্কর-প্রসঙ্গে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একটী বিশেষ সংবাদ দিয়াছেন, "ঐ পর্ব্বতের নাম সাবিত্রী পাহাড়। ঐ পাহাড় তিন ক্রোশ উচ্চ। * * * সাবিত্রীদেবীর মন্দির পর্ব্বতের শিরোভাগে। ঐ মন্দির মধ্যে সাবিত্রী সরস্বতী দুই মূর্ত্তি আছেন। * * * মন্দিরের পশ্চাতে এক কুণ্ড

আছে। ঐ কুণ্ডের জল অতি উত্তম। ঐ কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের কন্যা তপস্যা করিতেছেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর একাসনে তপ-জপ করিতেছেন। দেবীর ভোগান্তে পূজারি প্রসাদ দ্রব্যাদি দিয়া আইসেন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া সাবিত্রীর নিকটে সাধন করিতেছেন। ঐ পর্ব্বতে রাত্রে কেহ থাকে না। পূজারিগণ প্রাতে যাইয়া পূজাভোগ দিয়া তাবৎ দিবা ঐ স্থানে থাকিয়া সন্ধ্যার আরতি শীতল দ্রব্য দিয়া পর্ব্বত হইতে নীচে আপন আপন বাটীতে আইসে; কেবলমাত্র ঐ তপস্বিনী তথায় থাকেন। ঐ পর্ব্বতের মধ্যে নানাজাতি হিংস্র জন্তু আছে, এজন্য কেহ রাত্রে থাকে না। যদি কেহ গায়ত্রী-পুরশ্চরণ জন্য পর্ব্বতে থাকিবার মানসে থাকে, রাত্রে দেবীর মন্দির ভিতরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ তপস্বিনী নিঃশঙ্ক আছেন।"

৬ই শ্রাবণ গ্রন্থকার আজমীর দর্শন করেন। ৭ই শ্রাবণ কৃষ্ণগড় হইয়া পড়াগনি, ডুডু, বগড়ু, বড়েনা, ও বাউড়ি হইয়া ১১ই শ্রাবণ জয়পুর আসেন। ২২এ শ্রাবণ জয়পুর ত্যাগ করিয়া বাটিদরজা, পুয়া, দোশা, সেকেন্দরা বেশোয়া, ছোকরাবাব, গাগরআনি, শোঁক, সসা, ও মথুরা হইয়া ২০এ শ্রাবণ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। ২০এ শ্রাবণের রোজনামচায় গ্রন্থকার নিজের কথা এই রূপ লিখিয়াছেন, "পথে আমার নাসায় ব্যামহ হয়। তাহার পর তের ক্রোশ পদব্রজে আসিয়া সকলের সমভাবে বৃন্দাবনে পঁহুছি।"

২০এ শ্রাবণ হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বৃন্দাবনে বাস করেন। কাশীধাম ব্যতীত আর কোন তীর্থে এরূপ দীর্ঘকাল থাকিতে তাঁহার সুবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে

অনেক দিন থাকায় তাঁহার এই প্রধান বৈষ্ণবধামের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ব্রজপরিক্রমা" অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রাউস্ সাহেব বহুদিন থাকিয়া বহুলোকের সাহায্যে সবিস্তর এখানকার কীর্ত্তিকথা "মথুরা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের তীর্থ-ভ্রমণকার আমাদের উপযোগী, আমাদের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব-সরল মিষ্ট কথায় যেরূপ ভাবে বৃন্দাবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এমনটি কিন্তু অপর কোন পুস্তকে পাই নাই। অথবা তন্মধ্যে কোন কোন বিষয় আমাদের জানা থাকিলেও এ পর্য্যন্ত অপর কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গালী ভক্তের যত্নেই বৃন্দাবনের লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার হইয়াছিল, বাঙ্গালী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্যোগেই বৃন্দাবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই ভক্ত বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বিরাজমান। বৈষ্ণবভক্ত আমাদের বাঙ্গালী গ্রন্থকার বিশদভাবে সেই বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে বিমুখ হন নাই। তিনি বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীকে ও বঙ্গভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইয়াছেন বৃন্দাবনে তখনও কৃষ্ণপ্রেমের প্রস্রবণ ছুটিতেছিল; বৃন্দাবনে প্রতিকুঞ্জে, বৃন্দাবনের প্রতি ধূলিকণায় একদিন যে কৃষ্ণপ্রেম মুখরিত হইয়াছিল, তখনও বৃন্দাবনের প্রকৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছিলেন। বৃন্দাবনের ঝুলন-প্রসঙ্গে ভক্ত গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শ্রীধামে যত দেবালয় আছে, সকল স্থানেই ঝুলন হয়। * * ব্রজবাসিনী সকলে আপন আপন গৃহমধ্যে ঝুলে এবং শ্রীশ্রীরাধা-

কৃষ্ণ ঝুলনের গীত গায়, তাহাতে কাহাকেও কাহার লজ্জা নাই, কি শ্বশুর, কি ভাসুর, কি স্বামী, কি পিতা, কি ভ্রাতা, যে কেহ গুরুতর ব্যক্তি থাকুক তাহাতে শঙ্কা নাই, বরং তাহারা সম্মুখে আইসে না। সকল স্ত্রীলোক শ্রাবণ মাসে উন্মাদিনী হইয়া রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবর্ণনে মগ্ন থাকে।"

৬০ বর্ষ পূর্ব্বে তীর্থ-ভ্রমণকার বৃন্দাবনে যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এখন তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে বৃন্দাবনে ফুলদোল ও কুম্ভমেলা দেখিয়া ৫ই চৈত্র বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলেন এবং হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিতে চলিলেন। প্রথমেই হাটগ্রাম হইয়া কোবরি, তৎপর খএর, খুরজা, গোলাচি হাপর, মিরাট, মজফরনগর, কাজিকাপুর, রুড়কি ও জলাপুর হইয়া ১৫ই চৈত্র মঙ্গলবার হরিদ্বারে পৌছিলেন। চৈত্র-সংক্রান্তিতে কুম্ভমেলা হইবে, কিন্তু তখন হইতেই বাটী মেলা ভার। "থাকিবার বাটী ভাড়ার জন্ম সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা হইল, এক এক ঘর এক শত টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া।" এরূপ ঘরও সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পছন্দ হইল না। কুম্ভমেলার মধ্যে তিনি কিরূপভাবে বাস করিলেন, তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"গঙ্গার নিকট কড়ির উপর ঘাসের ছাপ্পর তৈয়ার করাইয়া তাহাতে তিন ঘর হইল। একঘর স্ত্রীলোকদিগের, এক ঘর দাসী-দিগের আর সমভ্যারী যাত্রীদিগের। এই দুই ঘর পূর্ব্বদ্বারী। যে ঘর দক্ষিণদ্বারী হইল, তাহাতে আমরা সকলে রহিলাম। চতুর্দ্দিকে ঘাসের টাটির প্রাচীর হইল। দক্ষিণদিকের পূর্ব্বকোণে পায়খানা হইল। তাহার বাহিরে দরোয়ানদিগের দেউড়ী হইল। পূর্ব্ব

দ্বারী বাড়ী হইল, সম্মুখে পরিসর রাস্তা রহিল। তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার নহর। ঐ গঙ্গাতীরে রম্মুয়ের স্থান।"

১৬ই চৈত্র হইতে ৩০এ চৈত্র পর্য্যন্ত কুশাবর্ত্তে তীর্থশ্রাদ্ধ, নীলপর্ব্বতে চণ্ডী ও নীলকণ্ঠেশ্বর, বিল্বকেশ্বর, কনখল, সূর্য্যকুণ্ড, নীলধারা, ত্রিধারা, পঞ্চধারা, সপ্তধারা পর্য্যন্ত দর্শন স্পর্শনাদি তীর্থযাত্রীর সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করেন। নীলপর্ব্বত ও কনখলের বর্ণনা অতি বিশদ ও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ।

তৎপরে কুম্ভমেলার কথা। এরূপ উজ্জ্বল ও সবিস্তর কুম্ভমেলার বর্ণনা আমরা আর কোথাও পাই নাই। তীর্থ-ভ্রমণে ২৪ পৃষ্ঠব্যাপী কুম্ভমেলার বর্ণনা আছে। তাঁহার কুম্ভমেলার বর্ণনা এত স্পষ্ট, এত উজ্জ্বল, এত সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন আমরা প্রত্যক্ষ সেই বিরাট উৎসব সন্দর্শন করিতেছি। এই মেলার বিশালতার একটু পরিচয় দিতেছি—

"হরিদ্বারে কুম্ভের মেলাতে বহু দেশস্থ নানারূপ মনুষ্যের একত্র মিলন হইয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোড় মনুষ্য, তদ্ভিন্ন জীবজন্তু আছে, চতুর্দ্দিকে তিনক্রোশ পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতি হইয়াছিল। আমরা যে স্থানে প্রথম আসিয়া ঘর বান্ধিয়াছিলাম, তাহার চতুর্দ্দিকে ময়দান রুড়ির উপর ছিল। কিন্তু দুই তিনদিন মধ্যে এমত বসতি হইল যে, তিল থুইবার স্থান রহিত হইল। এই সকল মরুভূমি লইয়া পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। স্থানাভাব এ পর্য্যন্ত হইল—মনুষ্য সকল কেবল বসিয়া এবং ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিল। গঙ্গার নূতন নহরের পূর্ব্বপার নীলধারার পশ্চিম প্রায় তিন ক্রোশ বাকসের জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলের

মধ্যস্থলে এই মেলার রক্ষার্থে এক কাপ্তান পল্টন ছিল। তৎপরে জঙ্গলে সকল লোক শৌচক্রিয়া করিত। কিন্তু এত মনুষ্যের সমাগম হইল, ঐ অপরিষ্কার ভূমি যত ছিল সকল স্থান পরিষ্কৃত হইয়া নগরের ন্যায় বসতি ও বাজার হইল। হরিদ্বারের উত্তর-দক্ষিণে নয়ক্রোশ ইস্তক হৃষীকেশ নাগাইদ কঙ্খল, পূর্ব্ব-পশ্চিমে চারিক্রোশ ইস্তক নীলপর্ব্বত নাগাইদ জোয়ানপুর, এই চতুঃ-সীমার মধ্যে সর্ব্বত্রে নগর, সহরের ন্যায় মনুষ্যের বসতি এবং বাজার স্থাপিত হইল। সকল পথে এমত লোক গতায়াত করিতে লাগিল যে, পথ চলিতে গেলে মনুষ্যের ঠেলাঠেলিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। তথাচ শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে এমত বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যে পথে লোক গমন করিবে, সে পথে পুনরাগমনের লোক আসিতে পারিবে না। এই বন্দোবস্ত জন্য স্থানে স্থানে রক্ষকগণ যষ্টিহস্তে ভ্রমণ করিতেছে। * * * বাজার সাজাইবার কথা কি পর্য্যন্ত লিখিব, অগণিত দোকান। মনোহারী দোকান নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, দিল্লীওয়ালাদিগের প্রায় পাঁচশত দোকান। * * * * * কাশ্মীর, অমৃতসহর, নূরপুর, লুধিয়ানা, রামপুর ইত্যাদি প্রদেশের পশ্মীনার উত্তম উত্তম বস্ত্র সকলের প্রায় দুইশত দোকান। বৃন্দাবনের এবং কাশ্মীর, অমৃতসহর, শিয়ালকোট, পেশোয়ার, মূলতান, ভোট, রামপুর ইত্যাদি সহরের মহাজন সকল পাহাড় হইতে উপবস্ত্রাদি আনাইয়া চারিশত দোকান লুইপটীতে হইয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদির দোকান এবং সূতার বস্ত্রাদি নানাদেশীয় দোকান পাঁচশতের কম নহে। পিতল, কাঁসা, তামা, দস্তা, লোহার বাসন এবং অন্যান্য তৈজস নানাপ্রকার আমদানী হইয়া কমবেশ একশত

দোকান ছিল। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, পদ্মবীজ, তুলসী, বিল্ব, পলার দোকান অগণিত। এইরূপ শ্বেতপাথরের থালা, বাটী, রেকাব, হুঁকা, কুরসী, মেজ, চৌকী, কৌচ, কেদারা ইত্যাদির দোকান, নানাজাতীয় মেওয়া, নানাজাতীয় মসলা, পান, তামাক, তরি-তরকারী, নানা রকম ফলাদি, নানা প্রকার আচার ও মোরব্বার শত শত দোকান হইয়াছিল। মেঠাই বা হালয়াইর দোকানের সংখ্যাই ছিল না। এতদ্দেশী লোক রসুই করিতে চাহে না। পুরি, কচুরি লইলেক, গঙ্গার তীরে বসিয়া আহার করিলেক, মেলাতে বেড়াইতে লাগিল, এইমত অনেক মনুষ্যের অবস্থা। এজন্ত পুরি, কচুরি অধিক বিক্রয় হয়। অমৃতসহরের দোকানদারদিগের পুরি কি উত্তম হয়, তাহা বলিতে পারি না। এমত পাতলা পুরি কোথাও হয় না, তথাচ তাহারা হাতে গঠিয়া ভাজিতেছে—চাকি বেলুন স্পর্শ করে না। সাহরণপুরের দোকানদার এবং দিল্লীর দোকানদার সকলে উত্তম উত্তম নানা রকম মিঠাই তৈয়ার করিয়া, মিঠাইতে ঘর বাড়ী দালান রথ ইত্যাদি নানা মত কারখানা করিয়া দোকান সাজাইয়াছিল। নীলধারার দুই কূলে কখল পর্য্যন্ত সপ্তধারাবধি রুড়ির উপরে খাকী, বৈষ্ণব, রামাৎ, নিমাৎ, গিরী, পুরী, ভারতী ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আসন হইয়াছিল। দশ হাজারের কম হইবে। ইহারা অযোধ্যা, জনকপুর, মিথিলা, নৈমিষারণ্য, তপোবন, কাঞ্চকুঞ্জ, বিঠোর, কদলীবন, পঞ্জাব, কাশ্মীর, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, গুজরাট, বোম্বাই, নাথদ্বার, দ্বারাবতী, কাঞ্চী, অবন্তী, জয়পুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, মাড়োয়ার, বিকানীর, জব্বলপুর, ঝাঁসী প্রদেশের নর্ম্মদা, আবু, গিরণার, গোহাগল, রামপুরা, কুশেনি, মণ্ডি,

সেপাট্টু, কুম্মু, সিমুল্যা এবং আর আর শত শত পর্ব্বত ও বন হইতে সর্কলে আসিয়াছেন। আপন আপন ভজন-সাধনে সর্ব্বদা মগ্ন আছেন। * * * অনেকে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত * * । শ্রী৺ইচ্ছাতে প্রতি দিবস এত দ্রব্যাদি উপস্থিত হয়, যে সকলে আহারাদি করিয়াও দাতব্য হয়, কেহ সঞ্চয় রাখে না। সঞ্চয়ের মধ্যে ধুনির কাষ্ঠ, যাহা পর্ব্বত হইতে শ্রম দ্বারা আনা হয়। * * যে সমস্ত আখড়াধারী মোহন্তগণ আসিয়াছেন, ইহাদিগের শিষ্য বড় বড় রাজা আমীর লোক সকল আছে। ইঁহাদিগের মানস-মতে খরচ-খরচা সকল দিয়া থাকে। এক এক মোহন্তের সমভ্যারে হাজার বারশত, গোনের শত, দুই হাজার, কাহার বা ইহার অধিক চেলাগণ সমভ্যারে আছে। * * স্নানের সময় আপত্তি হইয়া বিবাদ না হইবার জন্ত এমত সুযুক্তি করিল যে, পরস্পরে কাহার সহিত কাহার পথমধ্যে কি ঘাটে সন্দর্শন হইবার সংযোগ রহিল না। প্রথমে গোসাঞিদিগের স্নান। প্রথমে শ্রবণানন্দকে স্নান করিতে আনিলেন। সাহরণপুরের খোদ মাজিষ্টের ও কাপ্তেন সাহেব অগ্রগামী হস্তী আরোহণে একশত সিপাহী সাঠিহাতে, পুলিশের পদাতিকগণ পদব্রজে অগ্রপশ্চাতে লোক তফাৎ করিতে করিতে, লাঠি ফিরাইতে ফিরাইতে চলিল, তন্মধ্যে গোসাঞিয়ের সমভ্যারে চল্লিশটী উট, একশত সওয়ার ঘোটকের উপর, বার হস্তী, হস্তীর উপরে তাদের নিশান, গোসাঞি যে হস্তীতে আরোহণ করিয়াছেন তাহার রূপার আমারি, স্বর্ণ-খচিত ঝুল, শুণ্ডে স্বর্ণমণ্ডিত, গলদেশে পুচ্ছে রূপার তবক ইত্যাদি আভরণ, আমারি উপরে শ্রবণানন্দ মোহন্ত, দুই পার্শ্বে দুইশত চামর, রূপার দাণ্ডি, এক রায়চোবের ছড়ি, রূপার দাণ্ডি,

শিরোপরে আশাশোটা, পঞ্জা, বল্লভ, পঞ্চাশ আড়ানি, মোরছোল, এই সকল আসবাব। অগ্রে উটের উপর (ও) ঘোড়ার উপর ডঙ্কা এবং তাসা কাড়া বাদ্য আছে। এই সকল অগ্রে অগ্রে বাদ্যধ্বনি, পরে হাজার এগারশত চেলার সমভ্যারে এবং দুইশত পরমহংস, একশত দণ্ডী ও অপরাপর অভ্যাগত যাত্রীতে কমবেশ এক হাজার সমভ্যারে স্নান জন্য যাত্রা করিয়া নগরের পশ্চিম দিক্ হইয়া, পর্ব্বতের পূর্ব্বধার দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া হরপিড়ির ঘাটে পঁহুছিয়া, জলে নামিয়া প্রথমতঃ নিশানকে ঐ ঘাটের জলমধ্যে বাদ্যধ্বনি করিয়া আরত্তি করা হইল। পরে ঐ নিশানকে সপ্তবার পরিক্রম করিয়া সকলে স্নানাদি করিল। স্নান করিবামাত্র উক্ত সাহেবগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে ঐ সকল ব্যক্তিকে নৌকার পুল পার করিয়া, নীল-ধারার নিকটে রুড়ি হইয়া যে পথ নহরের ধারে ধারে আছে, ঐ পথে আসিয়া দ্বিতীয় পুলে পার করিয়া পুনঃ পশ্চিমপারে আসিয়া পশ্চিমমুখে যে পথ আছে, তাহাতে নামিয়া চৌয়াস্তাতে উঠিয়া যাহার যে স্থানে আখড়া, তাহাকে সেই স্থানে পঁহুছাইয়া দিল। এইমত গমনাগমনের প্রথা করিয়া রাজপুরুষেরা সকলে সদলে সমভ্যারে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বার গোসাঞি, মোহন্ত (ও) আখড়া-ধারীদিগকে পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া আসিয়া উক্ত রীতিক্রমে সকলকে স্নানাদি ক্রিয়া সমাধান করিল। বার আখড়ার মোহন্তের কাহার আসবাব নিশান, হস্তী, ঘোড়া, উট, আশাশোটা, চামর, মোরছোল ইত্যাদি আড়ানি পঞ্জা কাহার কম নহে, বরং গুজরাটের বলভদ্রী আখড়ার গোসাঞিদের সমভ্যারে এগার হস্তী ও হস্তিনী আছে। ইহা-দিগের গমনকালে কি শোভা তাহা একমুখে বর্ণনা করা যায় না।”

গোসাঞিদিগের স্নান শেষ হইলে তৎপরে সন্ন্যাসিগণও গোসাঞিদিগের মত শোভাসাজা করিলেন। "সন্ন্যাসিদিগের শিষ্য অনেক রাজা এবং ধনাঢ্যগণ আছেন। * * গদিয়ান সন্ন্যাসিগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্নানে যাত্রা করিলে পর সমভ্যারে কমবেশ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী, মস্তকে জটাভার, বিভূতিভূষণ, রুদ্রাক্ষ স্ফটিক পদ্মবীজের মালা ধারণপূর্ব্বক কাহার কটিতটে কৌপীন লাল রঙ্গের উপরে বহির্ব্বাস, কাহার লৌহ কি পিত্তলের শৃঙ্খল কটিবেষ্টিত, কাষ্ঠের কৌপীন, কেহ কেহ উলঙ্গ—গাঁজা চরস্ ভাঙ্ ধুতুরাতে চক্ষু ঢুলু ঢুলু সকলে শিবাকৃতি হইয়া "হর হর গঙ্গাধর বম্ বম্" গালবাদ্য করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে স্নানে গমন করিতেছেন, দেখিতে কিবা শোভা, তাহা কহিতে পারি না। কত শত ঊর্দ্ধবাহু অবধূত মৌনব্রতী অনেক সম্প্রদায় যোগিবেশে শিঙ্গা ডম্বুর লইয়া হর-গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন (করিতেছেন)। পূর্ব্বোক্ত পথে রাজপুরুষগণের সমভ্যারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান করিয়া পুল হইয়া পার করাইয়া পুনঃ পুলে পার করিয়া পশ্চিম পারে আসিয়া, যাহার যে আসন তথায় তাহাকে পহুছিয়া দিয়া পরে থাকী বৈষ্ণবদিগের স্নানার্থে লইয়া যাইল। * * ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে পহুছাইয়া রাজপুরুষগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে কখল যাইয়া রাজগণের স্নান জন্য তদিরে রহিলেন। প্রথমতঃ বিকানীরের রাজা স্নানে যাত্রা করিলেন। রাজার সমভ্যারে ত্রিশ হাজার লোক। প্রথমে ঘোড়ার উপর ডঙ্কা তাহার পর বাণ নিশান দুই শত, তাহার পরে খাসগেলাস, ভাল ভাল মুলতানী বনাতে কারচোবের কর্ম্ম, তাহার দুইশত স্বর্ণ রূপার আশাশোটা, পঞ্চাশ রূপার ছড়ের বল্লম, পঁচিশ পাঞ্জা, দশ ছত্র,

অতি উত্তম রেশমী কাপড়ে স্বর্ণতারে তারকুশী, কারচোব স্বর্ণের দাণ্ডি, মুক্তার ঝালর, একছত্র রাজার মস্তকে আর তদ্রূপ এক আড়ানী শ্বেতচামর, দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণ দাণ্ডি, মোরছোল, তদ্রূপ ত্রিশ হস্তী সুসজ্জিত, পঁচিশ ঘোড়-সওয়ার অস্ত্রধারী মায় বন্দুক রাজার অগ্রপশ্চাৎ আর দুই পার্শ্বে রক্ষার্থে আছে। কাপ্তেন ও মাজিষ্টর সাহেব আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে লইয়া অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় ঘুচাইয়া দিতেছে। এইরূপে গমন করিয়া সহরের পশ্চিমদিক্ হইয়া যে পথ দিয়া আর আর সকলে স্নানার্থে আসিয়াছিল, সেই পথ হইয়া রাজাকে স্নান জন্য আনিয়া হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া, কুশাবর্ত্তের ঘাটে পিণ্ডদান করাইবার জন্য আনয়ন করিল। রাজা ঘাটে পহুছিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেন। নয় সের সোণার নয় পিণ্ডদান, এক হস্তী মায় আসবাব, আর ভাল এক ঘোড়া, সুবর্ণের কড়া, মোতির মালা, হীরার অঙ্গুরি, শালের জোড়া, মূলতানী জোড়, পাগ, দোপাট্টা (৩) হাজার মোহর দক্ষিণা দিয়া আপন পাণ্ডাকে তাবৎ দ্রব্য দান করিয়া তক্তারামার উপর উঠিয়া যাত্রা করিলেন। তক্তারামার যোল দ্বার, রূপার নির্ম্মিত স্বর্ণখচিত সুশোভিত, আর চতুর্দ্দোলে সুলতানী বনাতের উপর কারচোবের কাজ করা উত্তম ঘেরাটোপে ঘেরা, বাঁশে সোণার মুখ, উপরে সোণার। এই মত চারি চতুর্দ্দোলে চারি রাণী আর সমভ্যারী সকলে হস্তিপৃষ্ঠে এই মতে সকলে কুশাবর্ত্তের ঘাট হইতে উত্তর দিকের পুল পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার নীলধারার পশ্চিম দিয়া যে পথ, তাহা দিয়া আসিয়া দক্ষিণের পুল দিয়া পশ্চিমপার হইয়া কঙ্খল যাইবার চৌরাহে পহুছিয়া তথা হইতে কাঙ্গালীদিগের দান জন্য সিকি আধুলি টাকা ফেলিতে ফেলিতে কঙ্খল পর্য্যন্ত

পড়ছিল। এইমত ক্রমে ক্রমে রাজাদিগের স্নান-দান কর্ম্ম সমাপন করাইতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বেলা ছিল।

গ্রন্থকার হরিদ্বারের কুম্ভমেলার বিবরণ যেরূপ সবিস্তার লিখিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে অতি সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। কুম্ভমেলার বিবরণে আমরা সেকালের ভারতীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সন্ধান পাই। এই মেলা উপলক্ষ্য করিয়া ভারতের সকল প্রদেশের, সকল সম্প্রদায়ের জনসঙ্ঘ, অতুল বিভবশালী ঐশ্বর্য্যের মহাড়ম্বরে উদ্দৃপ্ত কোটীপতি হইতে সম্পূর্ণ ভোগবিলাসবর্জ্জিত জ্ঞানপ্রভায় উদ্ভাসিত মুক্ত পরমহংস পর্য্যন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল প্রকার মানব, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য্য অসংখ্য দ্রব্যসম্ভার এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আহার্য্য অসংখ্য খাদ্যসামগ্রীর পরিচয় রহিয়াছে। এই মেলায় আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বহু বিষয় শিখিবার, দেখিবার ও ভাবিবার ছিল। সেই লোকচরিত্রের মহামিলনের মধ্যে সেকালের ধর্ম্ম-জগতের চিত্রের আভাস পাইতেছি। গ্রন্থকার ভারতবাসী হিন্দু-সাধারণের ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সম্প্রদায় ও পদোচিত আভিজাত্য লইয়া সমাজে প্রাধান্য, আত্মমর্য্যাদাবোধ, ধর্ম্মা-চরণের জন্য সকল প্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক আড়ম্বর ও দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে রেলগাড়ী বা পথঘাটের এখনকার মত স্ুবিধা ছিল না, তস্করের ভয়ে যে সময় পথ চলা অতিশয় বিপজ্জনক ছিল, সে সময়েও হিন্দু জনসাধারণ ধর্ম্মের জন্য, পুণ্যলাভের জন্য ও পার-লৌকিক উন্নতি-প্রাপ্তি-আশায় কিরূপ অকুতোভয়ে শত শত ক্রোশ দূরে গমন করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিত না, তাহার

পরিচয় ঐ কুম্ভমেলায় পাইয়াছি। এই সে দিন হরিদ্বারে মহাকুম্ভ হইয়া গিয়াছে। অনেকে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন; সেদিনও ধর্ম্মভীরু হিন্দুসমাজের কতকটা সজীবতা দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু এই মহাকুম্ভের ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকার যে কুম্ভমেলা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কুম্ভমেলার বিবরণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, হিন্দু-সমাজের নানাদিকে এখন যথেষ্ট বিপর্য্যয় হইয়াছে, লোকের মতিগতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আলোচ্য "তীর্থ-ভ্রমণ" গ্রন্থ হইতে সেকালের ও একালের নানা অবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিবার অনেক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে, এরূপ উপকরণ অন্যত্র দুর্লভ।

৮ই বৈশাখ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাখণ্ড দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইবার ক্রমেই তাঁহাকে হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে উঠিতে হইবে। তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন সস্ত্রীক কালীপ্রসাদ ঘোষ, কাশীর শিবরতন বাবু, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, রামচরণ চক্রবর্ত্তী, নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়ের মাতা ও জ্যেষ্ঠ বধূ, কালীবাবুর পুরোহিতের বধূ ও তাঁহার ছয় বৎসরের কন্যা, কালীবাবুর জ্ঞাতি-সম্পর্কে পিসী, দেওয়ান নন্দকুমার বসুর ভগিনী বিন্দুপারা ও কাঙ্গালী নাপিতের ভগিনী, বৃন্দাবনবাসিনী চারিজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, এ ছাড়া তাঁহাদের সঙ্গে একজন চাকরাণী দুইজন চাকর ও দুইজন দারোয়ান। তাঁহাদের মধ্যে কেবল বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ সস্ত্রীক দুইজনে দুই ঝাঁপানে, বাকি সকলে পদব্রজে চলিলেন। হিমালয়ের উপর উত্তরাপথ কি ভীষণ দুর্গম, পথচলা কিরূপ দারুণ

কষ্টসাধ্য, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখনকার দিনে অনেকেই পদব্রজে তীর্থভ্রমণ দূরের কথা—উপযুক্ত যান-বাহনের সাহায্যেও হিমালয়ের উত্তুঙ্গ মার্গে উঠিতে নারাজ, কিন্তু তখনকার দিনে ছোট বড় সকল হিন্দুই ধর্ম্মোদ্দেশে কত কষ্টই সহিতে পারিতেন, অম্লশূলরোগাক্রান্ত কেবল আমাদের ভক্ত গ্রন্থকার বলিয়া নহে, লক্ষপতি দেওয়ান নন্দকুমার বসুর ভগিনী প্রভৃতি যেরূপ সৎসাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মপিপাসার পরিচয় দিয়াছেন, এখনকার দিনে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই তাহা অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। ভক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সদলবলে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কম্বল মুড়ি দিয়া হিমালয়ের বন্ধুর প্রদেশে চলিয়াছেন। ক্রমে হৃষীকেশ দর্শন করিয়া লছমন-ঝোলায় উপনীত হইলেন। লছমন-ঝোলায় আসিয়া লিখিয়াছেন, "ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞান হত হইল। তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি—পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচশত হাত রশি, বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। যেমন সিঁড়িমই এই মত থাক থাক বাঁধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেলবন্ধ, কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার উপরে দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া ঐ খাদি কাঠের উপর পদক্ষেপ্ করিয়া ভীতব্যক্তি উপরের রজ্জু ধরিয়া ৺গঙ্গা পার হয়। একজন মনুষ্য যাইতে কি আসিতে পারে। যদি কেহ যাইতেছে আর বিপরীত পার হইতে কেহ আসিতেছে, তাহা হইলেই বড় কঠিন হয়। ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আইলে প্রাণ সশঙ্কিত। তাহার কারণ যে, ভাগীরথী ৺গঙ্গা আছেন, তাঁহার জল এত স্রোতবতী

যে, দশ বার শত মন যে প্রস্তর তাহাকে ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল, তথাচ তাহার কলকল শব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত এই বিকটরূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছুদূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আইলে অতিশয় আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন" এই অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমন ঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা-যায়, যেন পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে, 'পন্থি! সাবধান পগ্-ধ্যান, মুখে বল রাম নাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপ্‌না।' এই শব্দ শূন্যপথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহা বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোনক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে—দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল।"

গ্রন্থকার যেরূপ লছমন-ঝোলা পার হইবার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পাঠক বুঝিতেছেন কি দারুণ সঙ্কটজনক প্রএসাধ্য ব্যাপার। যাত্রিগণের ইহার পর যে পথক্লেশের লাঘব হইবে, তাহা নহে, এই

লছমনঝোলা হইতেই পথক্লেশ আরম্ভ। তৎপরে গ্রন্থকার ছয় ক্রোশ পথ আসিয়া ফুলাড়িতে লক্ষ্মণের তপোবন দর্শন করেন। তাহার ছয় ক্রোশ দূরে পাহাড়ের চড়াইর উপর বিজলীগ্রাম— "ছয় ক্রোশ ক্রমিক চড়াই, ইহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিশেষতঃ প্রথম পর্ব্বতের উপর এতদূর উঠিতে হইতেছে, কিন্তু জগদীশ্বরের এরূপ দয়া প্রকাশিত আছে যে, স্থানে স্থানে জলের ঝরণা এবং বৃক্ষের ছায়া। পাহাড়ে চড়িতে যত ক্লেশ তাহার শ্রমশক্তির উত্তম উপায় আছে। পর্ব্বত অতিশয় সুরম্য। বন, জল, স্থল, ফল ফুলে পর্ব্বত সুশোভিত।"

বিজলী হইতে দশ ক্রোশ দূরে ব্যাসঝোলা ও ব্যাসাশ্রম, এই ব্যাসাশ্রম হইতে ছয় ক্রোশ গিয়া লছমন-ঝোলার ন্যায় এক ঝোলা পার হইয়া যথাক্রমে দেবপ্রয়াগ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, রাণীবাগ, টেরির রাজধানী শ্রীনগর, শিরোবগড়া ও রুদ্রপ্রয়াগ। এই সকল স্থান দর্শন করিয়া সকলে গুপ্তকাশীতে আগমন করেন। এই দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতের উপরেও গ্রন্থকার সদলে প্রত্যহ ৮।১০ ক্রোশ হাঁটিয়াছেন। গুপ্তকাশীতে "গঙ্গার জল গোমুখ দিয়া আর যমুনার জল সিংহমুখ দিয়া উপর হইতে কুণ্ডে পতিত হইতেছে। * * অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী আছেন। ইঁহারা যোগসাধন করিতেছেন।"

তৎপর দিন সকলের তুঙ্গনাথ দর্শন। "তুঙ্গনাথের পাহাড় আট ক্রোশ উচ্চ চড়াই, বড় বিকট পথ, পাকদণ্ডিতে উঠিতে হয়। এক এক পদচিহ্নতে পদক্ষেপ করিয়া যষ্টি আশ্রয়ে আট ক্রোশ চড়িতে হইবে, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত উপরে বৃক্ষাদি আছে, বৃক্ষমূলে বিশ্রাম। এই মত তাবৎ দিবাতে। পর্ব্বতের শিরোভাগে যে তুঙ্গনাথের

মন্দির আছে, তাহাতে মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত। * * এই পর্ব্বত বরফে আচ্ছাদিত। মন্দির বরফে ঢাকিয়া থাকে।"

তুঙ্গনাথ দর্শন করিয়া গ্রন্থকার পাটন-চটী হইয়া হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে ত্রিযুগ-নারায়ণ দর্শনে আসিলেন। "এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্ত্তি আছে, আর মহাদেবের তিন যুগের ধুনি জ্বলিতেছে। * * * সাধনার স্থান নগরতুল্য—অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী মোহন্তগণ তপস্যা করিতেছেন। তপস্যার উত্তম স্থান—এই হিমালয়ে গিরিরাজ ও মেনকার বাসস্থান, গৌরীর জন্মস্থান। * * এ পর্ব্বতে ফল ফুলে বৃক্ষগণ সুশোভিত সজীবিত। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে জলের ভাল ভাল ঝরণা আছে। অন্য অন্য পর্ব্বত হইতে এ পর্ব্বতের মনুষ্যগণ মিষ্টভাষী, স্ত্রীগণ, বালিকা যুবতী কি বৃদ্ধা সকলেই সুসভ্য; কিন্তু বস্ত্রাভাব—কম্বল পরিধান এবং আচ্ছাদন। সকলের মস্তকে কম্বলের টুপী কিম্বা পাগড়ী।"

অনন্তর ঝিলমিল-চটী, মুণ্ডকাটা গণেশ, উষ্ণপ্রস্রবণযুক্ত গৌরীকুণ্ড ও ভীমগড়া হইয়া কেদারনাথে আগমন করিলেন। কেদারনাথে আসিবার পথে সাজসজ্জা ছিল—"গাত্রে তুলাভরা জামা, তাহার উপর লুই, বনাত কম্বল মুড়ি দেওয়া, হাতে আপন আপন যষ্টি, স্কন্ধে পূজা ভেটের দ্রব্যাদি।" পথের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—"গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় চারিশত ক্রোশ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া গমন করিতে হয়, বরফের পর্ব্বত কত যুগের বরফ জমিয়া আছে, তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার। চলিতে পায়ের সাড় থাকে না। যেমন ঝিনুঝিনা হইয়া পা অসাড় হয়, সেইমত বরফে পদক্ষেপে পদের অচৈতন্য

হয়। পথের ভীষণত্ব কি কহিব। বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত। তাহার বরফসকল কাটিয়া পথ হইয়াছে, এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে এই পরিসর পথ। যে যে স্থানে পদের কোন চিহ্ন আছে, তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে, তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশে পাশে পদক্ষেপ করে, তবে মহা বিপদ হয়। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ হইলে বরফে কোমর পর্যান্ত কোথায় অস্থায়ী হইয়া ডুবে, পূর্ব্বদিকে পদক্ষেপ হইলে কোথায় যায় তাহার নিরাকরণ হয় না, তাহার কারণ পাহাড়ের গোড়েন; কমবেশ দশ হাজার হাত নিম্নে মন্দাকিনী বহিতেছেন, তাহার উপরে বরফ আচ্ছাদিত আছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বরফ গলিয়া ফাঁক হইয়াছে, তথায় জানা যায় যে, মন্দাকিনীর স্রোত বহিতেছে। * * * এই সুকঠিন পথ হইয়া এক পুল পার হইয়া কেদার-নাথের মন্দির দেখা যায়, পুল হইতে এক ক্রোশ। এ বৎসর একশত এগার হাত বরফ পড়ে, তাহা কাটিয়া মন্দির বাহির করে। মন্দিরের চিহ্ন ইহাতে পায় যে, যত উচ্চ হইয়া বরফ পড়ুক, মন্দিরের উপর যে ত্রিশূল আছে, তাহা আবৃত হইবে না। যে সকল বাড়ী, ঘর, কুণ্ড, তীর্থ, দেবালয় আছে, সকল বরফে ঢাকিয়া আছে—কেবল ধবলাকার, তাহাতে অন্য চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, দেখিতে সুশোভিত। পুরাতন যে বরফ আছে, তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন, নূতন যে বরফ তাহা অতি শুভ্র, সাফা লবণের ন্যায় দানাদার। * * কেদারের মন্দির বরফে ডুবিয়াছিল। অদ্যাবধি মন্দির ভিতরের সকল বরফ যায় নাই, সর্ব্বদা জল পড়িতেছে। এই বরফ জন্য শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর অক্ষয়তৃতীয়া পর্য্যন্ত ছয় মাহা দ্বার রুদ্ধ থাকে। * * মন্দিরের

নিকট কোন মনুষ্য কি জীবজন্তু পশুপক্ষ্যাদি কিছু থাকিবার ক্ষমতা হয় না। এই ছয়মাস দেবগণে পূজা করে, এ কথা পূর্ব্বাবধি সকলে শ্রুত আছেন। এক্ষণে দেবগণের পূজা করার এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে, ঘরের ভিতরের ঐ ঘৃত প্রদীপ জ্বালিত থাকে, আর অর্ঘ্যের চাউল ও নীলকমল দিয়া যে পূজা হয়, তাহা ঐ মন্দির মধ্যে থাকে। * * * মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে আসিতে বরকে স্পন্দনরহিত হয়।"

মহাপ্রস্থানের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন—কিন্তু কোথায় ও কোন পথে যাইতে হয়, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। আমাদের গ্রন্থকার কেদার হইতে সেই মহাপথ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তরমুখে গমন করিয়া যাইতে পারিলে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব, যাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র দেহ বজ্রতুল্য হইয়া সকায়াতে স্বর্গে গমন করিতে পারেন। কিন্তু এই তিন ক্রোশ পথ যাওয়া অতি দুষ্কর, তাহার কারণ দিবারাত্র বরফ জলের ন্যায় বরিষণ হইতেছে, এই শীতবীর্য্যে কেহ মহাপন্থাতে গমন করিতে পারে না, যদি কেহ সাহস করিয়া ঐ পথে গমন করে, তাহা কদাচ পহুছিতে পারে না। তাহার কারণ ঐ পন্থাতে পদক্ষেপ করিতে যদি কিছু শব্দ হয়, তবে এমত বরফ খসিয়া পড়ে যে তাহাতে প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই, তাহার নাম খুনী বরফ। যে অঙ্গে ঐ বরফ স্পর্শ হয়, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ খসিয়া পড়ে। ঐ সকল কারণ জন্য শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের এবং টেরির রাজসরকার হইতে ৩৮ জন পার্ব্বতীয় মনুষ্য রক্ষক আছে—কোন ক্রমে কেহ বিনা অনুমতিতে ঐ পথে না যাইতে পারে। যে সকল রক্ষকগণ আছে, তাহারা লোমসমেত দুম্ব ভেড়ার চামড়ার জামা, ইজার টুপী, তাহার

উপর কম্বল আচ্ছাদনে থাকে। অগ্নির কুণ্ড সমভ্যারে ঐ রক্ষকগণ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কষ্টে যাইতে পারে, তাহার পর গমনের ক্ষমতা নাই।"

কি ভাবে সাধনা করিলে মহাপন্থা অতিক্রম করিয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শের অধিকার জন্মে, গ্রন্থকার তাহাও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি তিনি যেরূপ কেদারনাথ ও মহাপন্থার বর্ণনা করিয়াছেন, অপর কোন পুস্তকে আমরা এরূপ পরিচয় পাই নাই। কেদারনাথ দর্শন ও তীর্থকৃত্য সমাধা করিয়া "শত বৎসরের বরফ বেলওয়ার, সহস্র বৎসরের স্ফটিক হওয়ার আকরস্থান দেখিয়া" ভীমগড়া, গৌরীকুণ্ড, অগ্নিমঠ, বামনীচটী, তৎপরে অলকনন্দা পার হইয়া ক্ষেত্রপাল, পিপড়কুঠী, গরুড়গঙ্গা, কুমারচটী, জোষীমঠ ও পাণ্ডুকেশ্বর হইয়া বদরীনারায়ণে আসিলেন। কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণ আসিতে ১১ দিনে ৯৪ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইয়াছিল! বদরীনারায়ণের পাহাড়ে উঠিবার সময় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "গোজের চটির নিকট হইতে আটক্রোশ চড়াই বদরীনারায়ণের পাহাড়। * * চারিক্রোশ যাইয়া বরফ ভূমি, বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। স্থানে স্থানে প্রস্তরভূমি আছে। কেদারনাথে যেমত বরফ তাহা হইতে এ পাহাড়ে বরফ কম আছে, কিন্তু শীত অতিশয়। শরীরের স্পন্দন রহিত হয়। জলস্পর্শ করা অতিশয় কঠিন। আটক্রোশ যাইয়া এক কাষ্ঠের পুল অলকনন্দাতে আছে, তাহা পার হইয়া কিঞ্চিৎ পরে বদরীনারায়ণের মন্দির। * * * বাসাতে আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বদরীনারায়ণ দর্শন করা হইল।" গ্রন্থকার এখানে পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের

তপস্যার স্থান, বদরীনারায়ণের মহিমা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই লিখিয়াছেন,—"বৈকুণ্ঠ এই স্থান তাহার সংশয় নাই। মহাপ্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয়, অন্নপ্রসাদ সকলে সকলকে দিতেছে, মনোবিকার কিছুমাত্র নাই।" বদরীনারায়ণে আসিয়া কোথায় কি দেখিতে হয়, কিরূপভাবে তীর্থকৃত্য করিতে হয়, হিমালয়ের এই তুঙ্গশৃঙ্গে কি কি দ্রব্য ও পথ্যাদি পাওয়া যায়—এখানকার সুবিধা অসুবিধা সকল কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বদরীনারায়ণ হইতে ভোট বা তিব্বতের পথ সম্বন্ধে দেখা যায়—"এখান হইতে ভোটের রাস্তা নয় দিনের পথ উত্তর-পশ্চিম দেশ। ভোট গমনাগমন হইতেছে; অতিশয় বরফ, বরফের উপর হইয়া চলিতে হয়। ভোটের জুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে চলে না. কুশের জুতাতে গমন হয়।"

এই জ্যেষ্ঠ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সদলে বদরীনারায়ণ ছাড়িয়া পাণ্ডুকেশ্বর, কুমারচটী, জোষীমঠ, পিপড়কুঠী, ক্ষেত্রপাল, নন্দ-প্রয়াগ ও শিখকুঠী হইয়া মেলচৌরী আসিলেন। এখানে ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালারা বিদায় হইল। গ্রন্থকার ঐ বাহকগণ সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন,—"এই ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালাদিগের চিনথাকি টিকলি পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য অনেক মত কহা হইল এবং এখানের ঝাপান যত টাকায় যাইবে, তাহা হইতে পাঁচ টাকা অধিক পাইবে। তাহারা কোনমতে চারিদিবসের পথ নীচে আসিতে স্বীকার হইল না। তাহার কারণ কহে যে, "আমরা ইহার নীচে গেলে বাঁচিব না; নীচে অতিশয় রৌদ্র আমাদের বরদাস্ত হইবে না, সকলের ব্যামোহ হইবে। আমরা বরফদেশের পাহাড়ের মনুষ্য, মেলচৌরীর নীচের জায়গা আমাদিগের কোন ক্রমে সহ্য

হইবে না। এজন্ত ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালা বিদায় হইল। পুনরায় এখানে ঝাপান ও পিঠু লওয়া হইল।"

সে দিন মেলচৌরী হইতে লোহাগড়ে আসিয়া তৎপর দিন (১২ জ্যৈষ্ঠ) সকলে বুড়া-কেদারে উপস্থিত হইলেন। "এখানে কেদারনাথ আছেন কোশল্যা নদীর পূর্ব্বপারে।" তৎপরে কানা-গির চটি, টিকলি, রামনগরের বাজার, চিনখা, কাশীপুর, নৈনিতাল, সম্বল-মুরাদাবাদ, শিরসা, গোমা, দানপুর, কোয়েল ও বেশরা দর্শন করিয়া ২৪ জ্যৈষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার এখানে তাঁহার উত্তরাখণ্ড-ভ্রমণের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন,—

"যদবধি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তীর্থযাত্রা জন্ত উত্তরাখণ্ডে গমন হইয়াছিল, তদবধি দুই সন্ধ্যা আহার, কি শয্যা পাতিয়া বালিশ মস্তকে দিয়া শয়ন হয় নাই; কোন বালুকাময় ভূমিতে এবং পাহাড় পর্ব্বতের বনে জঙ্গলে হিংস্রজন্তুদিগের সম্মুখে ভ্রমণ গমন, ছোট বড় পর্ব্বত সকল লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। এমত এমত পর্ব্বত আছে, ক্রমিক চারি পাঁচ দিবস—প্রতি দিবস দশ বার ক্রোশ করিয়া চড়াই করিয়া সীমা পাওয়া যায় না। ঠিক খাড়া চড়াই কত স্থান আছে, উচ্চে উঠিবার সময় এক এক পদক্ষেপে মৃত্যুকালের শ্বাসের ন্তায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। বিনা-যষ্টিতে যুবক কি বৃদ্ধ, কি বালক কাহারও পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। উতরাই অর্থাৎ নামিবার সময়ে ততোধিক ক্লেশ। বিশেষতঃ পর্ব্বতে শীতের অত্যন্ত প্রভাব, আহার-দ্রব্য বিবিধ দাল যব গম মক্কা-মিলিত আটা। এই আহার করিয়া এক লক্ষ পর্ব্বত সত্তর লক্ষ ঝাড়ির পরিক্রম করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে কিম্বা হরিদ্বারে আসিতে হয়। বালুকাময় ভূমিতে এবং পর্ব্বতের প্রস্তরঘর্ষণে

বনের কণ্টকে পদ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে, দেহে অস্থিমাত্র থাকে, রস-রক্ত কিছুই দেহে থাকে না, বর্ণ বিবর্ণ হয়, আকৃতি বিকৃত হয়, এত কষ্ট করিলে উত্তরাখণ্ডে যে সব শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তাহা দর্শন স্পর্শন করিতে পারে। তীর্থাদি ভ্রমণ করিলে নানা দেশ এবং নানামত মনুষ্য ও তাহাদের কৃত ব্যবহার দেখা যায়।"

উষ্ণপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে হিমপ্রধান উত্তরাপথের তীর্থ-ভ্রমণ কিরূপ শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে সকলেই অবগত হইবেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্মের জন্য ঐ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে পশ্চাৎ-পদ ছিলেন না, তাহা আমরা এই তীর্থ-ভ্রমণ গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝিতেছি।

গ্রন্থকার হিমালয়ের কেবল তীর্থ-পরিচয় বা দ্রষ্টব্য স্থানের পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তদ্দেশীয় নরনারীর আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-ব্যবহার, রীতিনীতি, হাবভাব প্রভৃতি জ্ঞাতব্য অনেক কথাই স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং অবশেষে উত্তরাখণ্ড যাত্রার এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন,—

"কেদারনাথ গমনে চারি দিবসের পথ কেবল গোলাপ গাছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বন পর্ব্বত সুশোভিত, গন্ধে আমোদিত, আর পথে পথে কত শত স্থানে কুন্দ শেফালিকা করবী ইত্যাদি আছে। বদরীনারায়ণ যাইবার পথে তিন দিবসের পথ সেউতি, দুই দিবসের পথ গোলাপ পুষ্পের বন, বরাক ফুলের গাছসকল জবাপুষ্পের ন্যায় অম্বর হইতে দৃষ্ট হইতেছে,—এইরূপে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিলে দুঃখ ক্লেশ মায়া মোহ কিছু থাকে না।"

পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনে ৺নন্দকুমার বসুর কুঞ্জে তাঁহার বাসা

স্থির ছিল। ২৫এ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২১এ ভাদ্র পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া দীর্ঘ পথক্লেশের কতকটা শ্রান্তি দূর করিলেন। ২২এ ভাদ্র ব্রজভূমির চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এবার ব্রজমণ্ডলের সকল বন উপবন ও সকল লীলাস্থানই দেখিয়া লইলেন। যেখানে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আছে ও বিশেষত্ব পাইয়াছেন, সমস্তই তীর্থ-ভ্রমণে বিবৃত হইয়াছে।

২০এ মাঘ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সদলে কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবন হইতে চৌমুয়া, কুশী, হোড়েল, পরওল, বল্লভগড়, ফরিদাবাদ, দিল্লী, তেলিআড়া, পুলানি, রাই, বশৌনি, শামহাল, পাণিপথ, কর্ণাল ও বটালা হইয়া থানেশ্বরে উপনীত হইলেন,—"যথায় কুরুক্ষেত্র তীর্থ"। কুরুক্ষেত্র ভারতীয় আর্য্য-জাতির সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মক্ষেত্র। তীর্থ-ভ্রমণে সংক্ষেপে এই অতি-প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্রের যেরূপ পরিচয় আছে, অপর কেহ এরূপভাবে বর্ণনা করিয়া যান নাই। মৃত্তিকাসম্বন্ধেও তিনি লক্ষ্য করিয়া জানাইয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের তাবৎ মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, কিন্তু এক্ষণে সকল স্থানে রক্তবর্ণ দেখা যায় না। * * * পথিমধ্যে যে স্থানে বৃষ্টি-জল বদ্ধ আছে, তাহা বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইল—রক্তের ন্যায় জল, মৃত্তিকার নীচে রক্তবর্ণ, ইহাতে বোধ হয় অধিক বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ হইলে সকল লাল জল হয়। অস্থিপুরা নামে যে তীর্থ আছে, তাহাতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে যত ব্যক্তি হত হইয়াছেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়া যে স্থানে সৎকারাদি করেন এবং কুরুকুলবধূগণ যথায় সহমৃতা হন, সেই স্থান দীপ হইয়া আছে।"

১০ই ফাল্গুন কুরুক্ষেত্রের তীর্থ-কর্ম্মাদি শেষ করিয়া পিপলি,

তেওড়া, সাহাবাদ, টগরি নদী, বাণগঙ্গা, অম্বালা, রাজপুরা, সরেন্দা, বল্লের সরাই ও লস্করের সরাই হইয়া লুধিয়ানা সহর পাইলেন। এখানে দেখিলেন, "উত্তম স্থান, পশমিনা বস্ত্রাদি এবং উর্ণাবস্ত্রাদি নানামত জন্মিতেছে। * * * পশম যাহাতে শাল জন্মে, উল যাহাতে লুই জন্মে, তাহার বিক্রয় হইতেছে।" পুল পার হইয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের ফোলবের দুর্গ দেখিতে পান। তথা হইতে ১২॥০ ক্রোশ যাইয়া ফাগুওয়াড়া সহরে এক গুহার মধ্যে সাধু দর্শন করেন। ঐ সাধু ১২ বৎসর কাল দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছেন। "কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই, মৌনব্রতের ন্যায়, আহার ক্রমে স্বল্প করিয়া একণে কেবল এক পোয়া দুগ্ধ কিঞ্চিৎ বাতাসা, দেহ কৃশ হয় নাই।" ফাগুওয়াড়া হইতে ওয়া নদী, বেহালা, হরেলা, হুশিয়ারপুর ও তাহার অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বাহাদুরপুর গ্রামে গুরু নানকের গদি দর্শন করেন। এই সুদূর উত্তরপশ্চিম প্রান্তে ছাউনী মধ্যে শ্যামপুকুরনিবাসী শ্রীরাধা নাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাহাদুরপুরে "চাকুরিয়ানিবাসী শ্রীযুত দীন নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়।"

এই হুশিয়ারপুর হইতেই আমাদের তীর্থ-ভ্রমণকার জালামুখী দর্শনের উদ্যোগ করিলেন। তথা হইতে বোটা, আমবাগ, রাজ-পুরা (এখানে ২৪ বাহুবিশিষ্টা মহিষমর্দ্দিনী দেবী) ও চম্পা (চম্বা) দর্শন করিয়া ২৩ ফাল্গুন শিবরাত্রির দিন জালামুখী তীর্থে আগমন করেন। তাঁহার জালামুখীর বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক।

"মহাদেবীর মন্দির পর্ব্বতের মধ্যস্থলে, মন্দির দক্ষিণদ্বারী, মহারাজ রণজিৎ সিংহকৃত স্বর্ণমণ্ডিত চতুর্দ্দিকে কলস আছে,

তাহার উপরে স্বর্ণের ছত্র আছে, সম্মুখে দুই স্বর্ণমণ্ডিত ব্যাঘ্র আছে। মন্দির মধ্যে মহাদেবীর জ্যোতি জ্বলিত আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের উত্তরদিকে চারি জ্যোতি আছে, মধ্যস্থলে দুই জ্যোতি, তাহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রবল, আর দুই জ্যোতি কখনও প্রকট কখনও অপ্রকট থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে সকলে পূজা হোম করে, ঐ জ্যোতি হইতে অগ্নি জ্বালিত করিয়া লইতে হয়, অন্ত অগ্নি স্থাপিত হয় না। * * * ছাগবলি অনিয়মিত হইতেছে—যাহার যখন ইচ্ছা। মহাদেবীর জ্যোতি প্রায় পর্ব্বতের সকল স্থানে আছে, কোথাও গুপ্ত কোথাও প্রকাশিত। জালন্ধরপীঠের পরিক্রম ৪৮ ক্রোশ।"

বলা বাহুল্য ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকার ৪৮ ক্রোশই পরিক্রম করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য, তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এখানকার কালীঘাটের হালদার-কন্যাগণের ব্যবহার অনেকেই বিলক্ষণ জানেন, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জ্বালামুখীর পরিচয়ে কিরূপ লিখিয়াছেন, একবার পাঠ করুন—

"পাণ্ডাদিগের বাটীর কন্যাগণ দেখিতে অতি সুন্দরী। ১ বৎসর অবধি ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সকলে মহাদেবীর মন্দিরে আসিয়া যাত্রীদিগের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করে। দেখিতে দেবীরূপা, কাহারও মনে বিকার নাই, অন্ন পাইলেই সন্তুষ্ট, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অনায়াসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে, খাদ্যদ্রব্যাদি সম্মুখে ধরিলে অনায়াসে ভক্ষণ হয়।"

জ্বালামুখী দর্শনাদি করিয়া রাজা উমেশচন্দ্রের রাজধানী নাদ-

গুন হইয়া সকলে ফতেপুর, শীমুল্যা, হামিরপুর, লম্বুড়, গোপালপুর ও রাজার তলাও দর্শন করিয়া রেওয়াড়েশ্বর তীর্থে আসিলেন।

এখানে গ্রন্থকার রেওয়াড়েশ্বর তীর্থের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক ও হৃদয়াকর্ষক। এরূপ তীর্থের কথা আমরা আর কোথাও শুনি নাই। একটু পরিচয় দিই—

"রেওয়াড়েশ্বর তীর্থকুণ্ড মধ্যে প্রস্তর, উপরে মৃত্তিকা, তদুপরি বৃক্ষাদি হইয়াছে, ঐ পর্ব্বত জলে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার নাম বেড়া, পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। কুণ্ডের জল অতলস্পর্শ, দীর্ঘে-প্রস্থে দুই ক্রোশের পরিক্রম। এই জল-মধ্যে সাত বেড়া আছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হনুমান্, দুর্গা, গণপতি (ও) ধরমধারী অর্থাৎ লোমশ মুনির—এই সাত বেড়া আছে। ইহার মধ্যে ছয় বেড়া বার মাস ভাসিয়া বেড়ায়। মহাদেবী দুর্গার যে বেড়া, শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস ভাসে, দশ মাস মহাকুণ্ডের ঈশান কোণে থাকে। উক্ত বেড়া সকল বেড়া হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মার বেড়ার উপরি নলের এবং ঘাসের বন, এক অশ্বত্থ, এক বট এই দুই বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের বেড় ১৷৷০ হাত ২ হাত হইবে, খাড়াই তিন হাত, তাহার পর শাখা-পল্লবে শোভিত বেড়া দীর্ঘে-প্রস্থে ৬ হাত হইবে। বিষ্ণুর বেড়াতে নলের গাছ ও ঘাস আছে, দীর্ঘ-প্রস্থে ৩ হাত। শিবের, গণেশের ও হনুমানের তিন বেড়া ঘাসময় ছোট বেড়া। লোমশ মুনির বেড়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫ হাত, অনেক নলের গাছ এবং ঘাসে বন হইয়া আছে। * * * কুণ্ডের তীরে যে বন আছে, ঐ বনের সহিত একত্র হইয়া থাকে। যাহার যে মূর্ত্তি দর্শনের মানস হয়, ভাবনা করিলে সেই বেড়া ভাসিয়া আসিয়া দর্শন দেন, আপন মনোনীত পূজা ইত্যাদি করিলে ইচ্ছামতে ভাসিয়া স্থানান্তরে

গমন করেন।" আমাদের কৌতূহলী গ্রন্থকার এখানকার অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বেড়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন—

"এ বেড়া সকল কি মত স্থাপিত, তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে, নিম্নে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে, তাহার উপরে বৃক্ষাদি হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ধরিয়া বহুমত দেখিয়াছি কোনক্রমে হেলাইতে পারা যায় নাই। ঐ বেড়াতে ধ্বজা দিবার জন্য খনন করিয়া বাঁশ পুতিতে হয়, ঐ বেড়ার উপর পাণ্ডারা আরূঢ় হইয়া বিশেষ বলপূর্ব্বক বসাইল, তাহাতেও হেলিল না, পরে বেড়া হইতে মৃত্তিকা লওয়া হইল। কিন্তু তীরে যে স্থানে বেড়া ছিল, তথায় জল অধিক নহে, তাহাতেও অধিক আসিয়া থাকে না, কেবল গাছ-ঘাস ভাসে। আর অতলস্পর্শ জল যেখানে, সেখানেও ঐ মত অল্প মৃত্তিকা আর গাছ-ঘাস ভাসিতেছে দেখা যায়, কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য হয় না যে, বেড়ার বিপরীতদিকে ডুব দিয়া অন্য দিকে উঠিতে পারে। যত নিম্নে ডুবে, সর্ব্বত্রই পাথর মাথায় স্পর্শ হয়। * * * কুণ্ড-পরিক্রমার্থে গমন করিয়া, পরিক্রমের অর্দ্ধেক পথ যাইতে দেখা গেল যে, ব্রহ্মার বেড়া ভাসিয়া উত্তর দিক্ হইতে যাইতেছে। উহা যৎকালে মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, আমরা মনে করিলাম যে, পূর্ব্ব দিকের বাতাস, এজন্য পশ্চিম দিকে বান ভাসার ন্যায় যাইতেছে, কিন্তু ঐ মধ্যস্থলে যাইয়া স্থির হইল, তাহার পর ঝড়ের ন্যায় বাতাস বহিতে লাগিল, এক অঙ্গুলিও নড়িল না।

"বেড়াগুলির এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন করিয়া লাহোরের সর্দ্দার নেহাল সিংহ বহু লোক জলে নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

এইরূপে বহুকাল হইতে এখানকার ব্যাপার দেবমায়া বলিয়া অবধারিত হয়। পৌরাণিক আখ্যায়িকাও প্রচারিত আছে।"

"এই স্থলে লোমশ মুনি তপস্যা করিয়া জলের উপরি দাঁড়াইয়া আপনার ইষ্টসাধন করেন। * * * চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এমত যোগে আছেন যে, তাঁহার গাত্রে নলগাছ ও ঘাস হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া দেবগণ মুনি প্রতি মনোভীষ্টসিদ্ধ বর দিয়া গেলেন, মুনির মানস হইয়াছিল, আমার প্রতি যেমন পাষাণ হইয়াছ, সেইমত পাষাণ হইয়া থাক। এই মুনির মানসে দেবগণ এবং মুনি পাষাণ হইয়া ভাসিতেছেন।"

"রেওয়াড়েশ্বর কুণ্ড হইতে ৩ ক্রোশ পর্ব্বতের উপর এক দেবী আছেন, তাঁহার নাম নয়নাদেবী। এস্থলকে সকলে নয়নপীঠ কহে। * * এই তীর্থে ভোটদেশীয় এবং মহাচীন দেশের মনুষ্য আইসে। তাহারা ধনাঢ্য ব্যক্তি। চীনদেশীয় ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার বেড়ার অতিশয় মাস্য করে, অনেক দানাদি করিয়া থাকে এবং প্রস্তরে নাম-ধাম খোদিত করিয়া দেয়। ভোটের যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ আইসে, তাহারা সকলে মদ্য-মাংসভোজী, অতিশয় উন্মত্ত, তাবৎ রাত্র কুণ্ড-পরিক্রম এবং ভজন করে।"

তীর্থ-ভ্রমণকার যে রেবাড়েশ্বর-কুণ্ড ও নয়নপীঠের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা ভারতের সমতলবাসী হিন্দু সাধারণের প্রায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। আমরা ভারত মহাসাগরের মধ্যে সচল শৈলমালার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে হ্রদ বা বৃহৎ জলাশয়-মধ্যে তরু-লতা-সমাচ্ছন্ন এরূপ সচল পাষাণখণ্ডের সন্ধান আর কোথাও পাই নাই। ঐ স্থান ভূতত্ত্ববিদ্ ও বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ক্ষেত্র সন্দেহ নাই।

রেবাড়েশ্বর কুণ্ডে তীর্থকৃত্য সারিয়া গ্রন্থকার পার্ব্বত্য মণ্ডী-রাজ্যের রাজধানী মণ্ডীনগরে আগমন করিলেন। সে দিন মণ্ডী নগরে বড় ধূমধাম। "মণ্ডীনগরে এক দেব-মেলা হয়, রাজার অধিকারে যত পর্ব্বত ও গ্রাম আছে, তাহাতে যত দেবদেবী আছেন, সকলে শিবচতুর্দ্দশী-রাত্রিতে মণ্ডীনগরে আসিয়া অষ্টাহ দেবমেলা হইবে, তাহাতে ১৫০ দেব-দেবী পাহাড় হইতে আসিয়াছেন। সকল দেব-দেবীর সহিত পাহাড়ের বাস্ত ও পাহাড়ীয়া সকল লোক আসিয়াছে। ইহাতে নগরে বহু-লোকের সমাগম হইয়াছে, তিলার্দ্ধ স্থান নগর মধ্যে নাই। * * * আমরা যে দিবস মণ্ডীনগরে উপস্থিত, সে দিবস মেলা, * * * পাহাড়ের দেব-দেবী বড় প্রত্যক্ষ। * * রাজার শাসন এইরূপ আছে যে, ছোট-জাতিতে খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে না এবং দোকান কিম্বা জলের বাউড়ি স্পর্শ করিতে পারে না।"

সকলে মণ্ডীতে উৎসব দেখিয়া পারমণ্ডী হইয়া নিতান্ত পিচ্ছিল "হড়গড়ানে" চড়াই ও উতরাই পথ হইয়া মণ্ডীরাজ্য ছাড়াইয়া কুলু-রাজ্যের রাজধানী বেজওরে পৌঁছিলেন। এখানে রাজধানী দর্শন করিয়া তৎপরে পার্ব্বত্যগঙ্গা ও বিপাশা নদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া বিওড় হইয়া বামুনকোঠীতে আসিলেন। "এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস এবং অন্যান্য জাতির বাস। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কম্বলবস্ত্রপরিহিত। মৎস্য, মাংস সকল জাতি আহার করে।"

গ্রন্থকার বামুনকোঠী হইতে ৪।০ ক্রোশ আসিয়া মণিকর্ণ-তীর্থ পাইলেন। "মণিকরণ-তীর্থ অতি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। * * * পশ্চিম বিষ্ণুকুণ্ড, উত্তর হরেন্দ্র পর্ব্বত, পূর্ব্ব ব্রহ্মনাল, দক্ষিণ পার্ব্বতীগঙ্গা এই সীমা মধ্যে দীর্ঘে ২ ক্রোশ, প্রস্থে ২ ক্রোশ

মণিকরণ নাম। ইহার মধ্যে পার্ব্বতী-গঙ্গা ও হরেন্দ্রগঙ্গার জলে যে স্থলে সঙ্গম হইতেছে, তাহার উপরে দুই কুণ্ড আছে। নীচে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে দুই হাতের অধিক জল আছে, জলের আস্ফালন। কিঞ্চিৎ উপরে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে এক হাত জল। দুই কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ অর্থাৎ গরম, অঙ্গ স্পর্শমাত্র দগ্ধ হয়। অতিশয় ধূম, সর্ব্বদা ধূম উঠিতেছে, অন্ধকার হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে অন্ন খেচরান্ন রুটী মালপো পায়স ডাল তরকারি ভাজি ইত্যাদি যাহা কুণ্ডে দিবে, তাহা সুপক্ক হইয়া সুখাদ্য হয়, অগ্নি-সংস্কার-পাকে বহুবিধ রন্ধনের সুগন্ধাদি দ্রব্য দিয়া সুযত্নে পাক করিলেও এতাদৃশ সুখাদ্য হয় না।" লীলাময়ের কি আশ্চর্য্য লীলা! এই দুর্গম প্রদেশে বিনা অগ্নি-সংস্কারে বিনা উনানের সাহায্যে রন্ধনকার্য্য চলিতেছে—উষ্ণপ্রস্রবণের উষ্ণ জলের তাপেই পাক-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। কি নিয়মে ঐ কুণ্ড মধ্যে পাক করিতে হয়, বিচক্ষণ গ্রন্থকার তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রেবাড়েশ্বর কুণ্ডের বেড়ার পরিচয়ে আমরা চমৎকৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু মণিকর্ণের উষ্ণ-কুণ্ডে রন্ধন-প্রক্রিয়া ততোধিক বিস্ময়জনক। পুরাণে এই স্থান 'কুলিন্দ' নামে অভিহিত। আমাদের পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহাই "কুলান্ত-পীঠ" নামে পরিচিত করিয়াছেন। ইহা "সকল দেবদেবীর তপস্যা এবং বিহার-স্থান।" "এখানে পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের মনুষ্য কদাচ কেহ ফকিরীবেশে আসিত, এজন্য দোকানাদি ছিল না।" বাস্তবিক এই দুর্গম তীর্থের বিষয় সাধারণ গৃহস্থের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল, তাই কোন পর্য্যাটক বা তীর্থযাত্রী এই মনোরম ও চমৎকার লীলা-স্থানের পরিচয় দিয়া যান নাই। তীর্থ-ভ্রমণকার বিশদভাবে

এই তীর্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং তাহা পাঠ করিতে করিতে আমরা এখানকার বহুতর উষ্ণ-প্রস্রবণ ও সুপ্রাচীন তীর্থসমূহের অভিনব সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

গ্রন্থকার মণিকর্ণে তীর্থকৃত্যাদি শেষ করিয়া বিষ্ণুকুণ্ড ও ভরিগ্রাম হইয়া বামনকোটিতে আগমন করেন। এখান হইতে "নদী পার হইয়া ৪ ক্রোশ খাড়া চড়াই পর্ব্বতে উঠিয়া বিজলীশ্বর মহাদেব" দর্শন করেন। এই শিবলিঙ্গ-সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে "বার বৎসর অন্তর বজ্রপাত হইয়া খান্ খান্ হইয়া ভগ্ন হন। পরে ঐ সকল খণ্ড একত্র করিয়া মাখন দিয়া বাঁধিয়া দিলে পুর্ব্বমত শিব-মূর্ত্তি হয়।" বিজলীশ্বর দর্শনান্তে ৪ ক্রোশ নামিয়া রাজা জ্ঞান-সিংহের রাজধানী কুল্লুসহর দর্শন করেন। এখানে তিনি বহু দেব-দেবীর মন্দির দেখিয়া আসেন। এখানকার পরশুরামের মন্দির সম্বন্ধে গ্রন্থকার আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"ঐ মন্দিরের বার বৎসর অন্তর একবার দ্বার খোলা হয়।"

কুল্লু হইতে বেজওর, রোপড়, ডোলচি, কুমাদ, অরু-কুফরু, ফুটাখল, গোমা, হিরাবাগ, শিবালয়, সমরুট, ও ভাঙ্গাহাল হইয়া বৈজনাথ আগমন করেন। এই বৈজনাথ সাধারণতঃ 'বৈজনাথ' নামে পরিচিত। হিমবৎখণ্ডে এই বৈজনাথ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। প্রবাদ অনুসারে "ত্রেতাযুগে দশস্কন্ধ রাবণ দেবদেব মহাদেবের নিকট কঠোর পঞ্চতপাঃ ইত্যাদি * * তপস্যা করিয়া-ছিলেন। * * দশস্কন্ধ কঠোর তপদ্বারা দেবদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আপন কক্ষ-মধ্যে ধারণ করিয়া লঙ্কাপুরে লইয়া যাইবার মনন করিলেন। দেবের মায়া—* * পথিমধ্যে বরুণ দ্বারা এই মায়া প্রকাশ করিলেন যে, রাবণের প্রস্রাবের পীড়া

উপস্থিত হইলে শিবজিকে পথিমধ্যে রাখিয়া প্রস্রাবে বসিলেন; তদবধি বৈদ্যনাথজি ঝারখণ্ডেতে রহিলেন।" এ স্থলে ১॥০ ক্রোশ পরিক্রম, ইতোমধ্যে অনেক দেবদেবী আছেন, অনাদি শিব আছেন ও প্রধান দেবী আছেন।" এখানে গ্রন্থকার বৈদ্যনাথের বিভিন্ন দেব-দেবী ও মন্দিরাদির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিবার সময় ৮ ক্রোশ দূরে 'ব্যোবারণা' নামে প্রাচীন নগরের বিবরণ দিয়াছেন। প্রাচীন পুরাণাদিতে এই স্থান প্রাবরণ, কর্ণপ্রাবরণ বা কুথপ্রাবরণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরে পরগুল, ধরমলা ও ভাগণ্ড হইয়া নাথনা গ্রামে আগমন করেন। এই নাথনার অর্দ্ধক্রোশ দূরে গির্ণারবাসী প্রসিদ্ধ সাধু বাক্‌সিদ্ধ মস্তরাম বাবাকে দর্শন করেন। তিনি মস্তরাম বাবা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মস্তরাম বাবার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের অধিক * * কিন্তু চাক্ষুষে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বোধ হয় না।" তীর্থ-ভ্রমণে এই সাধু মহাত্মার অসাধারণ দৈবশক্তির পরিচয় আছে।

অতঃপর গ্রন্থকার নগরোট হইয়া কাংগড়ার সুপ্রসিদ্ধ জালন্ধর-পীঠ বা জোয়ালাতীর্থ দর্শন ও বিশদভাবে এই তীর্থের বর্ণনা করেন। এখানকার প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বজ্রেশ্বরী। "মহারাজ রণজিৎসিংহ বাহাদুর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির করিয়া স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, অধুনা এই দেবী হিন্দুর প্রধানা উপাস্যা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইনি বৌদ্ধ বজ্রযান-সম্প্রদায়ের নিকট পূর্ব্ব হইতেই বজ্রধাত্বেশ্বরী বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তিব্বত, ভোট প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধগণ অদ্যাপি এই দেবীর পূজা দিতে আসেন।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে সময় কাংড়ায় গমন করেন—সেই

সময় কাঙ্গড়া সহর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "কমবেশী হাজার দোকান ছিল, এক্ষণে সহর ভাঙ্গিয়া ভাগশু পাহাড়ে সহর হইতেছে। * * * * রাজা সংসারচন্দ্র সপরিবারে নেওোর পাহাড়ে বন্দী আছেন, এই রাজার সহিত ইংরাজ বাহাদুরের যুদ্ধ হয়।"

জালন্ধর-মাহাত্ম্যে এখানকার ৩৬০ তীর্থের পরিচয় আছে, তীর্থ-ভ্রমণে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে।

জ্বালাদেবী বা জালন্ধর-পীঠের পরিক্রমা শেষ করিয়া গ্রন্থকার গোগাপীরের আস্তানা ও রৌপ্যমণ্ডিত গুহামধ্যে চিন্তাপূরণী দেবী দর্শন করেন। তৎপরে হুশিয়ারপুর, রাজরাজেশ্বরী, সন্তোকগড়, রায়পুর ও কোটগ্রাম হইয়া নয়নাদেবী দর্শনে আগমন করেন। "এই স্থানে ভগবতীর নয়ন পতিত হয়, এজন্ত নয়নপীঠ কহে। দেবীর নাম নয়না।" এখানকার তীর্থকৃত্য সারিয়া পুনরায় সন্তোকগড়, মানপুর, হুশিয়ারপুর, কাঙ্গড়া, লুধিয়ানা, বিদড়া বা বিজাপুর, অম্বালা, পিপ্‌লি, কর্ণাল, পাণিপথ, রশোলি, এবং শেষে দিল্লীর 'কাবেলী দরজা' হইয়া যমুনার নিগমবোধের ঘাটে তীর্থস্নান করিয়া মোগল-রাজধানী দিল্লীসহরে আগমন করেন। আমরা নানা গ্রন্থে দিল্লীর বিবরণ পাঠ করিয়াছি ;—দিল্লীর পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে অর্থাৎ দিল্লী-রাজধানী প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরাজ-শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বে কিরূপ শোভা, সম্পদ ও সমৃদ্ধির লীলা-নিকেতন বলিয়া পরিচিত ছিল, দিল্লীর প্রত্যেক দ্রষ্টব্য অলিগলির কথা, শেষ মোগল বাদসাহের দরবার ও অন্তঃপুরের পরিচয়, দিল্লীর নাগরিক হইতে হাট-বাজারের কথা, দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ

দেওয়ান-ই-আম, মোতি-মস্‌জিদ্‌, দেওয়ান্‌-ই-খাস, গায়কদিগের মজলিস্‌, বাদশাহী উদ্যানাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এরূপভাবে কেহ লিখিয়া যান নাই। গ্রন্থকার প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে পৃথুরাজার কেল্লার মধ্যে যোগমায়া দেবীর মন্দির, পৃথুরাজার যজ্ঞভূমি ও রাজধানীর সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। পৃথুরাজার যজ্ঞভূমির চিহ্ন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"মুনিগণ রাজসিক যজ্ঞ করিয়া অষ্টধাতুনির্ম্মিত এক স্তম্ভ যজ্ঞকুণ্ড মধ্যে স্থাপিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, 'এই স্তম্ভ-রসাতল নাগরাজের মস্তকোপরি স্থাপিত করিলাম, যত দিবস স্তম্ভ থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্যভ্রষ্ট হইবে না।' এই বাক্য রাজা শ্রবণ করিয়া মনে সন্দেহ হওয়াতে ঐ স্তম্ভ ছেদন করিতে অর্থাৎ উঠাইবার জন্ত নড়াইতে ঐ স্তম্ভের গোড়া দিয়া রক্তস্রাব হইল। মুনিগণ রাজার মনে সন্দেহ জানিয়া রাজার প্রতি কুপিত বাক্যে কহিলেন, 'যদর্থে স্তম্ভ স্থাপিত তাহা পূর্ণ হইবে না এবং ঐ স্তম্ভ ঈষৎ দক্ষিণপশ্চিমে হেলা রহিল।' স্তম্ভের উপর দেবনাগর অক্ষরে সকল বৃত্তান্ত খোদিত আছে।"

এখানে গ্রন্থকার যে প্রবাদ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। বলা বাহুল্য, এই স্থানই চাঁদকবির 'পৃথ্বীরাজরাসো' নামক গ্রন্থে "ইন্দ্রপ্রস্থগড়" বলিয়া পরিচিত। এই গড়ে ভারতগৌরব শেষ হিন্দু-নৃপতি পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করিতেন বলিয়া, এই স্থান পরে 'পিথোরা কা কিলা' বলিয়া অভিহিত হয়। তীর্থ-ভ্রমণকার যে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ স্তম্ভটী অদ্যাপি দিল্লীর লাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে—তাহা হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীরাজের বহু পূর্ব্বে সম্রাট্‌ অশোকের

সময়ও ঐ স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল, পরবর্ত্তীকালে মুসলমান বাদশাহেরা সেই প্রাচীন লিপি উঠাইয়া সেই স্থানে পারসী লিপি বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ হইতেই ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ হিন্দু-গৌরব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইতেই ঐ স্তম্ভচ্ছেদন-সম্বন্ধীয় প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ-প্রসঙ্গ শেষ করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গড়মুক্তেশ্বর ৩০ ক্রোশ, গঙ্গাদেবী তীর্থ। মুক্তেশ্বর শিব পাণ্ডবদিগের স্থাপিত ও তথা হইতে হস্তিনা ৩ ক্রোশ, যথা কুরু-কুলের আদিরাজ্য।"

গ্রন্থকার ১৩ই বৈশাখ হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দিল্লী পরি-ভ্রমণ করেন, এবং এই সময় মধ্যে যাহা কিছু দেখিয়াছেন, দ্রষ্টব্য সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ গ্রন্থকার দিল্লী পরিত্যাগ করেন। চৌমুরিয়া, বদরপুর, ফরিদাবাদ, রাজা নাহরসিংহের রাজ্য বল্লামগড়, বগলা, পরওল, বনচারী, হোড়েল, কোটবন, কুশী, সাতুই ও চৌমুয়া হইয়া ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃন্দাবনে আসিলেন। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৮ই অগ্র-হায়ণ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে অপেক্ষা করেন।

৯ই অগ্রহায়ণ সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মথুরা ও নওরঙ্গাবাদ হইয়া করে সরাই আসিয়া সদলে বজরায় আরোহণ করেন। এখান হইতে জলপথে প্রথমে গোঘাট, তৎপরে সেকন্দরীবাগ হইয়া আগরা সহরে উপস্থিত হইলেন। আগরায় যাহা কিছু পাওয়া যায় এবং যাহা কিছু দ্রষ্টব্য সমস্তই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তাজমহলের বর্ণনা বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী।

আগরার পর যেখানে যেখানে তাঁহাদের বজরা লাগিয়াছিল ও যে যে স্থান দর্শন করিবার সুবিধা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানের নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—

প্রথমে নাগরীয়া, পরে তুলার কারবারের জায়গা চিনবাস ও তৎপরে বটেশ্বর। "বটেশ্বর সহরতুল্য স্থান, ভাদড়িয়া রাজার রাজ্য। রাজবাটী আছে এবং বটেশ্বর ও গৌরীশঙ্কর আর চতুর্ভুজ নারায়ণের সেবা (ও) দেবালয় আছে" ইত্যাদি। গ্রন্থকার যে সময়ে বটেশ্বর দর্শন করেন, তৎকালে এখানে বড় মেলা বসিয়াছিল। "ব্রজভূমের মধ্যে এই বটেশ্বরের মেলা প্রধান মেলা। সকল দেশের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।" এই মেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তীর্থ-ভ্রমণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বটেশ্বর-বিক্রমপুরের পর পান্না-রাজধানী, নওগাঁ (এখানে রাজা মহেন্দ্রসিংহের কেল্লা), এখান-কার ধোপাঘাটে গঙ্গার উপর গ্রন্থকার তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করেন। নওগাঁর পর ঘাট্কো, ইটয়া, চণ্ডোলী, আদোনী, ভরে, যমুনা ও চম্বলনদীর সঙ্গম, অরুয়া, কালপী, কোলহের, গড়াত, হামিরপুর, বেটুয়া, মোওই, পড়ুয়া, কোরণি, বারা, প্রদন, চেল্লাতারা, মোগলপুর, জোহারপুর, ধোরপুর, ফরি, লচ্চেটা, হটমপুর, রাজা বিশ্বনাথসিংহের গুরুস্থাপিত করলিগ্রাম, প্রসিদ্ধ ডাকাইত সর্দ্দারের নামে প্রসিদ্ধ চরথা ও মরথা গ্রাম, কৃষ্ণগড়ের ঘাট, গড়হা, লকনপুর, কল্যাণপুর, মই, রাজাপুর, কামতাপুর, রাওড়, নকট, পরদোঙা, প্রতাপপুর, সগুড়া, নশীপুর, ময়না, সেরগড়, আলিসাহেবের হাওয়াখানা, মহব্বতগঞ্জ, বেড়ুয়াঘাট, ও মওয়া হইয়া এলাহাবাদ বা প্রয়াগ। গ্রন্থকার যাত্রাকালে প্রয়াগে মাত্র ৩ দিন এবং প্রত্যাগমনকালেও মাত্র ৩ দিন অবস্থান করেন।

Z-11

প্রয়াগ হইয়া লকটুয়া, বায়া, ইটুহারা, রসুলাবাদ, কলিঞ্জর, সমরনাথ, নওগাঁ, বেরাশপুরা, রানপুর ও নগর গ্রাম হইয়া বিন্ধ্য-বাসিনী দর্শন করেন।

গ্রন্থকার বিন্ধ্যাচলস্থ বিন্ধ্যবাসিনী দেবীস্থান ও পার্শ্ববর্তী মৃজা-পুরের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বাক্‌পতির "গৌড়বধ-কাব্যে" আমরা যেরূপ বিন্ধ্যবাসিনীর উপলক্ষে বলিদানের পরিচয় পাইয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের তীর্থ-ভ্রমণকার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—প্রভেদের মধ্যে বাক্‌পতির সময় নরবলির আধিক্য ছিল, কিন্তু বৃটীশগবর্মেণ্টের সুনিয়মে নরবলি নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহার স্থানে পশুবলি। তীর্থ-ভ্রমণে লিখিত হইয়াছে—"মহাকালীর সম্মুখে প্রতি দিবস অনিয়মিত বলি প্রদান হয়। রুধিরধারে স্থান পরিপূর্ণ আছে। বিন্ধ্যাচলবাসী প্রায় সকলে মৎস্য-মাংসভোজী এবং দেবীস্থান জন্য সুরাপানাদি আছে।"

মৃজাপুর হইতে চণ্ডালগড়ে আসিয়া বজরা লাগে। এই চণ্ডালগড় এক্ষণে চুনার বা চনার নামে খ্যাত, পূর্ব্বে চরণাদ্রিগড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার তিনক্রোশ দূরে সাহেবদিগের থাকিবার নূতন বাঙ্গালা শোভিত ছোট-কলিকাতা। এখান হইতে ৬ ক্রোশ আসিয়া কাশীরাজের রাজধানী রামনগর বা ব্যাসকাশী। তৎপরে অসিঘাট, কেদারঘাট হইয়া নারদঘাটে বজরা লাগান হইল। সে দিন সকলে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণাদি দর্শন করিয়া বজরাতেই তীর্থোপবাস করিয়া রহিলেন। তৎপর দিন সকলে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট ও কেদারেশ্বর দর্শন করিয়া বাঙ্গালিটোলায় এক ভাড়া বাড়ীতে উঠিলেন।

১২৬৩ সালের ১৭ই পৌষ হইতে ১২৬৪ সালের ১৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত গ্রন্থকার কাশীধামে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘকাল কাশী-বাসহেতু পুঙ্খাপুঙ্খরূপে কাশীধামের বিবরণ সংগ্রহের সুবিধা হইয়াছিল সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মধ্যে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তিনি স্বদেশাগমনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনকার দিল্লীর সংবাদপত্রে মিরাট ও দিল্লীর সিপাহী-বিদ্রোহ সংবাদ পাইয়া সকলেই বিচলিত হইলেন। মনে করিয়াছিলেন যে, কাল-বৈশাখী থামিলেই স্বদেশযাত্রা করিবেন, কিন্তু এখন আর কাশীত্যাগ করা হইল না।

গ্রন্থকার তৎকালে লোক-মুখে ও সংবাদপত্রপাঠে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, সে সমস্তই লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ২৯এ বৈশাখ (১৮৫৭ খৃঃ অঃ, ১০ই মে) হইতে ৩০এ জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন) পর্য্যন্ত দিল্লী, মিরাট, আগরা, মথুরা, আলিগড়, জৌনপুর, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, যেরূপে বিদ্রোহ দমন করা হয়, গ্রন্থকার সংক্ষেপে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক বহু ইংরাজ যদিও সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন, কিন্তু সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর রচনা বলিয়া বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় রাজভক্তবর্গের, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর কৃতকর্ম্মের কথা যাহা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ অনাবশ্যক বোধে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমাদের বাঙ্গালী গ্রন্থকার তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে তীর্থ-ভ্রমণের 'সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ' অংশ বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ মূল্যবান্ ও আদরের জিনিস। গ্রন্থকার পরস্বাপহারী লুণ্ঠক সিপাহীদিগকে

কিরূপ ঘৃণিতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে কিরূপ ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা তাহার কতকটা নিদর্শন পাইতে পারি।

১৭ই আশ্বিন সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির সহিত নৌকাযোগে কাশী ছাড়িলেন। কাশী হইতে ৫ ক্রোশ আসিয়া প্রথমে গোমতী, তৎপরে সৈয়দপুর হইয়া গাজিপুরে আগমন করিলেন। এখানে তাঁহার প্রিয়পুত্র সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ডাক্তারী করিতেন। গ্রন্থকার পুত্রের বাসায় সপ্তাহকাল অপেক্ষা করেন। এই কয়দিন গাজিপুরে যাহা কিছু দেখিবার সমস্তই দেখিয়া লইয়াছিলেন এবং বিশদভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২৬এ আশ্বিন গাজিপুর হইতে নৌকা ছাড়িয়া বাবলাবন, বীরপুর, চৌসর, বগসর বা বক্সর, ভোজপুরের অন্তর্গত হরদি, ছবলি, হালিম, মানিরা, ভবানিয়া ও পদমিনা, ডোমরার সামিল, ত্রিভবানী, রিবিলগঞ্জ, সারণ ছাপরা, ডুরিগঞ্জ, শোণভদ্র, দানাপুর ও বাঁকিপুর হইয়া পাটনায় আসেন। এখানে কালীবাবুর পরিবারদিগকে রাখিয়া কেবল তিনি, কালীবাবু ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তিন জনে পাল্কী করিয়া বহু কষ্টে গয়াভিমুখে চলিলেন। পথে পুনপুনাতীর্থ, দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি লালখাঁর নিবাস ভুবরিগ্রাম, মশৌড়ি, জাহানা, মকদমপুর, চাগানবাগ প্রভৃতি হইয়া ৩রা কার্ত্তিক গয়াধামে আগমন করেন।

গ্রন্থকার উপরি উক্ত যে সকল স্থান দর্শন করেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও দিয়াছেন। প্রথমবার যখন গয়াধামে যান, তৎকালে এখানকার হাটবাজারের যেমন শোভা ও আড়ম্বর দেখিয়াছিলেন,

এবার সিপাহীবিদ্রোহের পর তাহার বিপরীত দেখিলেন। "গয়াধামের বাজার সকল দেখিলাম শ্রীভ্রষ্ট, পূর্ব্বমত দোকান সকল দ্রব্যাদিতে সুশোভিত নাই, মনুষ্যগণের সুখ নাই, ব্যবসায়িগণ অতিশয় দুঃখিত আছে। সাহেবগঞ্জে পূর্ব্ব যেমত চক বাজার ছিল, তাহার কিছুই শোভা নাই এবং সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গলা সকল কেহ দগ্ধ কেহ ভগ্ন এই মত হইয়াছে, কাছারির বাঙ্গলা অগ্নিদগ্ধ, জেলখানার দ্বার ভগ্ন, ডাক্তারখানার ঘর উৎপাটিত, বাঙ্গালীদিগের অনেকে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে, অনেকে স্ত্রীপুত্র পরিবারদিগকে দেশে পাঠাইয়া একাকী আছে, ধনিগণ অনেকে নিধ'ন হইয়াছে, গয়ালদিগের বাটীতে দরওয়ান চাকর বৃদ্ধি, অর্থহানি হাহাকার ধ্বনি। বিষ্ণুপদ দর্শনে সন্ধ্যার পর চারি দণ্ড রাত্রি হইলে দ্বার রুদ্ধ হয়। এই মত ত্রাসিত হইয়া গয়াভূমে সকলে আছে।" গয়ার এইরূপ দুর্দ্দশা বর্ণনার পর গয়ালদিগের মুখে শুনিয়া ও স্বয়ং এখানকার অবস্থা জানিয়া সিপাহীবিদ্রোহের দুর্ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুনরায় যখন গয়া দর্শনে আসেন, সে সময় পুনরায় বিদ্রোহীর আগমন আশঙ্কা করিয়া সকলেই সশঙ্কিত ছিল, ধনদৌলত সকলই গোপন করিয়াফেলিয়াছিল, এমন কি যেখানে গয়ালেরা অযাচিতভাবে যাত্রীর খরচ চালাইবার জন্য কর্জ্জ দিতেন, সেরূপ স্থলে গ্রন্থকার প্রার্থনা করিয়াও তাঁহার গয়ালের নিকট হইতে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার সে সকলের গোলযোগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "গয়াভূমি টলটল করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন পুনরায় গয়াসুর উঠিয়াছে, সেই মত মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের অন্নাদি আহার করা হইল না, জলযোগ করিয়া থাকিতে

হইল। * * * বিষ্ণুপদ দর্শন করিতে গমন করিয়া দর্শনাদি চরণ তুলসী লইয়া বাসায় আসিয়া পেড়া ও পাথরবাটীর জন্ত অনেক তবির করিলাম, কিছুই পাইলাম না। পেড়ার দোকান বন্ধ, পাথরবাটীর দোকান মাত্র নাই, কেবল বাটী ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে।" গ্রন্থকার অতিকষ্টে এ রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রত্যূষেই সকলে গয়া ত্যাগ করিলেন। তথা হইতে প্রথমে ৭ ক্রোশ দূরে বেলাচটী এবং সেখানেও বিপদের আশঙ্কা করিয়া ৩ ক্রোশ দূরে মকদমপুরের চটীতে আসিয়া অবস্থান করেন। এখান হইতে জাহানা, মশৌড়ী, নাদাওন, পুনপুনা ও পড়সার চটী হইয়া সকলে পুনরায় পাটনার সবজিবাগে আগমন করেন। পাটনায় তিন দিন মাত্র থাকিতে হয়। তৃতীয় দিবস তিনি গঙ্গাতীরে ষট্ বা ষষ্ঠীব্রত দর্শন করেন। কোথায় কি ভাবে কিরূপ সমারোহে ষটের মেলা হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই দিবস সহযাত্রী স্ত্রীপুরুষ সকলেই নৌকায় আসিয়া উঠেন। পর দিন প্রাতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ দিনকার রোজনামচায় চকের ঘাট, মারুগঞ্জ, বাবুরাজির বাগান, বৈকুণ্ঠপুর ও রূপসগ্রামের সংবাদ এবং রূপসের উত্তর তীরবাসী সুপ্রসিদ্ধ দস্যুসর্দ্দার জালেমজোলেমের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে যথাক্রমে বাড়, মকিয়াপুর দো, দরিয়াপুর, সূর্য্যগাড়া, মুঙ্গের, জরাসন্ধগড়, সীতাকুণ্ড, জাঙ্গিরা বা জহ্নুমুনির আশ্রম, ভাগলপুর, কহল গাঁ, পাথরঘাটা, পীরপৈন্তি, গঙ্গাপ্রসাদ, সাঁকড়িগলির পাহাড়, কুড়িখোল, রাজমহল, নিমতলা, লক্ষ্মীপুর, কান্‌সাটের বাজার, শিবগঞ্জ, ছাপঘাটীর মোহানা, শঙ্করের বাজার, জঙ্গিপুর, বালানগর, গয়সাবাদ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, সয়দাবাদ, খাগড়া,

বহরমপুর, সাটুই, কপালেশ্বর, কালীগঞ্জ, শিরলি, নলেপুর, বেল- হারিগঞ্জ, অজয়নদের মোহানা, কাঁটোয়া, দাঁইহাট-দেওয়ানগঞ্জ, মাটিয়ারি, খোসালপুরের চড়া, অগ্রদ্বীপ, পাটুলী, বিল্বগ্রাম, আলুনে কড়কড়ে, রুকনপুরের বাজার, মেঢ়তলা, কাঁকশিলি, বালডাঙ্গা, বেলপুখুরিয়া, সোণাডাঙ্গা, কেশেডাঙ্গা, মাতাপুর, ত্রিমোহানী, মাধবগঞ্জ, নবদ্বীপ, নলেপুর, হাড়ভেঙ্গা, মির্জাপুর, মথুরাপুর, অম্বিকাকাল্না, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, জিরেট-বলাগড়, চাকদহ, শিজেডুমুরদহ, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, ভদ্রেশ্বর, কাউগাছি, গরিটির বাগ, নবাবগঞ্জ, পাণ্ডারঘাট, বৈদ্যবাটী, নিমাই- তীর্থের ঘাট বা দিগঙ্গ, টিটাগড়, সেওড়াপুলি, মণিরামপুর, কানাই দেওয়ানের দহ, দেবগঞ্জ, সাতুবাবুর বাজার, শ্রীরামপুর, চাণক, মাহেশ, বিশালক্ষীর দহ, রিসড়া, খড়দহ, সুখচর, পাণিহাটী, কোন্নগর, কোতরঙ্গ, আগড়পাড়া, এড়িয়াদহ, উত্তরপাড়া, নসরাঁই, বরাহনগর, কাশীপুর, ভদ্রকালী, বালি, বারাকপুর, ঘুসড়ি, শালিখা, গোলাবাড়ীঘাট, হাবড়া, রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, চিৎপুর, সুরের বাজার, পরে বাগবাজারের বান্ধাঘাট। এইখানে অবতরণ।

এইরূপে তিনি নৌকাপথেগঙ্গার পার্শ্বে ও উভয় কূলে যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়াছিলেন বা পাইয়াছিলেন তৎসমুদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল নাম করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ঐ সকল স্থানের মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানগুলির দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তীর্থভ্রমণ-রচনার প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গলে গঙ্গাতটস্থ জনপদগুলির যেরূপ পরিচয় আছে, * এই তীর্থভ্রমণ হইতে তাহার

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত তীর্থমঙ্গল দ্রষ্টব্য।

কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। গঙ্গার স্রোতের ক্রমশঃই পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

যাহা হউক সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থভ্রমণ হইতে হাঁটা-পথে ও জলপথে উভয় প্রকারে বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ যে ভাবে সুদূর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে তীর্থ করিতে যাইতেন, তাহার আমরা বিশদ পরিচয় পাইয়াছি। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ১২৬৪ সালে ৩০এ কার্ত্তিক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তৎপূর্ব্বেই হাওড়া হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে খুলিয়াছে, সেই সঙ্গে হাঁটাপথে ও জলপথে গমনাগমনও এক প্রকার বন্ধ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এই তীর্থভ্রমণ প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর শেষ বিবরণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কলিকাতায় ৭ দিন মাত্র থাকিয়া পুত্র-পরিজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলেন ও নানা তীর্থ হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, যাহাকে যাহা দিবার তাহা বিলি করিয়া দিলেন। ৭ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নৌকায় স্বগ্রাম রাধানগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতা হইতে রাধানগর পর্য্যন্ত যে যে স্থান হইয়া গিয়াছিলেন এবং যে যে স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও লিখিয়া রাখিতে ভুলেন নাই। ৯ই অগ্রহায়ণ তিনি আপনার প্রিয় জন্মভূমি রাধানগরে ফিরিয়া আসেন। বহুকাল পরে তাঁহার চিরশান্তির আবাসে শান্তি-লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিচার! ঘরে আসিয়া তিনি স্থির হইতে পারিলেন না, মধ্যমা মাতাঠাকুরাণীর আর্ত্তনাদের সহিত বুঝিলেন, "মধ্যম ভ্রাতা বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছে। এই শ্রুতমাত্র দারুণ শোকের ন্যায়

বক্ষঃস্থলে আঘাত হইয়া বোধ হইল বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর শত সহস্র শেলাঘাত হইতেছে—এই আশঙ্কাতে তাবৎশরীরে কম্প হইয়া চৌকী হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।”—এখানেই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের রোজনামচা বা তীর্থভ্রমণকাহিনী শেষ হইয়াছে।

উপরে যে পরিচয় দিলাম, তাহা হইতেই এই আলোচ্য গ্রন্থের উপাদেয়তা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তিনি যেখানে যে বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি মনে হইবে। আয়াস ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যাঁহাদের ভাগ্যে আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত তীর্থস্থান দর্শনে সুবিধা নাই, তাঁহারা ঘরে বসিয়া এই গ্রন্থ হইতে তীর্থসমূহের বিশদ পরিচয় জানিতে পারিবেন। গ্রন্থকার আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে ছোটবড় কোন তীর্থের এমন কি তাঁহার সময়ে প্রসিদ্ধ অপরাপর নগর গ্রামাদির পরিচয়ও বাদ দিয়া যান নাই।

এই গ্রন্থখানি কেবল তীর্থপরিচয় নহে, এই তীর্থভ্রমণে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুসমাজের চিত্র আছে, ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে যখন রেলপথ হয় নাই, যখন ইংরাজী শিক্ষা এরূপ প্রসারিত হয় নাই, তৎকালে হিন্দুগণ কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ, দেবদ্বিজভক্ত, সর্ব্বত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, সৎসাহস ও সত্যপ্রিয় ছিলেন, এই তীর্থভ্রমণ হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

———

ভাষার পরিচয়

উপরে গ্রন্থ-পরিচয়-প্রসঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণের বহু স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই গ্রন্থের ভাষার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গ্রন্থ-রচনা পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এমন গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। সেই পরিচয় দিতেছি—সহজ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর নিজ ভাব-ভঙ্গিতে কিছু লেখা ক্রমে দেখিতেছি, একটা পাপের মধ্যে দাঁড়াইতেছে। এই গ্রন্থেরই ভাষা দেখিয়া একজন মনীষী বলিয়াছেন, ভাষাটা যেন কেমন কেমন। অর্থাৎ না আছে ইহাতে দেবভাষার গাম্ভীর্য্য, না আছে ইহাতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাখর্য্য। তা নাই বটে, কিন্তু এই তীর্থ-ভ্রমণ-ব্যাপারে বাঙ্গালী আপনার ভাবভঙ্গি, ভয়, ভালবাসা, ভ্রমণের সুখ-দুঃখ, ভক্তির উচ্ছ্বাস, অতি সরল সহজ সাদা কথায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা যে সুন্দর, এমন কথা বলি না। যে খোদকারিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, সে খোদকারি এ গ্রন্থে নাই বলিলেই হয়। আছে গ্রন্থকারের দৃষ্টির পরিচয়। এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি অতি অল্প লোকেরই আছে।"

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত-শাস্ত্রবিৎ প্রবীণ সাহিত্যিক পণ্ডিতবর তারা-কুমার কবিরত্ন মহাশয় গ্রন্থের ভাষা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তক যে সময় লিখিত, সে সময় বঙ্গের ইদানীন্তন সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত মাতৃভাষা মাতৃ-গর্ভে নিহিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আধুনিক মাতৃভাষার একজন সিদ্ধহস্ত সুলেখক কর্ত্তৃক এই

গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হয় না।" বাস্তবিক সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সে সময়ের তুলনায় এই গ্রন্থের ভাষাও উচ্চাসন লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের ভাষা সমালোচনা করিয়া যথার্থই লিখিয়াছেন, "তীর্থভ্রমণের ভাষা সে কালের ভাষা, হয় ত অনেকে পাঠ করিয়া সময়ে সময়ে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না; কিন্তু কালাত্যয়ে ভাষার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। আবার শেষ ষাটি বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা, সংস্কৃত শব্দ, প্রত্যয় ও সমাসের সমাবেশ ও ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণ নিবন্ধন বঙ্গভাষার সমধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। * * * তীর্থ-ভ্রমণের ভাষা ভাল, বাঙ্গালা সরল, প্রাঞ্জল ও সকলেরই বোধগম্য। আভিধানিক শব্দের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, অথচ ওজস্বিতার অভাব নাই। এ ভাষা সকলেরই পছন্দ হওয়া উচিত। * * আমরা শব্দের আড়ম্বর চাহি না, শব্দের মেঘগর্জ্জন চাহি না। এ কথা সত্য যে, বেশ-ভূষণে বিশ্রীকেও একটু সুশ্রী দেখায়; কিন্তু প্রকৃত সুশ্রীর অলঙ্কারের অভাবে ক্ষতি হয় না। শকুন্তলা বল্কল-পরিহিতা হইলেও পরমা সুন্দরী।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের ভাষা সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"নিত্য দশ পনর মাইল পথ হাঁটিয়া তীর্থাদি দর্শন করিয়া তীর্থের সমস্ত ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাহ করিয়া যদুনাথ যে সময়টুকু পাইতেন, তাহাতে তীর্থ-ভ্রমণের রোজনামচা লিখিয়া রাখিতেন। সে রোজনামচা পড়িয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা—তৎকালে বিষয়ী লোকদের মধ্যে যে বাঙ্গালা চলিত,

খাঁটী সেই বাঙ্গালা। খৃষ্টীয় উনিশ শতকের আরম্ভে তিন রকম বাঙ্গালা চলিত—(১) ভট্টাচার্য্যদিগের বাঙ্গালা, (২) আদালতের বাঙ্গালা ও (৩) বিষয়ী লোকদের বাঙ্গালা। প্রথমটীতে টোলে যে সকল সংস্কৃত বই পড়া হয়, সেই সকল সংস্কৃত বইএর সংস্কৃত শব্দ অনেক থাকিত। দ্বিতীয়টীতে পারসী, আরবী ও উর্দ্দু শব্দ বেশী থাকিত। তৃতীয়টীতে সংস্কৃতও থাকিত, আরবীও থাকিত, পারসীও থাকিত, কিন্তু কিছুই অধিক পরিমাণে থাকিত না, কোন কড়া শব্দ থাকিত না, যাহা দেশে প্রচলিত, যাহা সকলে বুঝিতে পারিত, সেই শব্দই থাকিত। যদুনাথের বাঙ্গালা খাঁটী এই বাঙ্গালা। ইহার পর বাঙ্গালার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; তিন রকম বাঙ্গালায় মিশিয়া এক রকম অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে কি, তীর্থ-ভ্রমণের ভাষা প্রকৃত প্রাণের ভাষা—হৃদয়ের অভিব্যক্তি, ইহা খোস-পোষাকী ভাষা নহে, মনে মনে তর্জ্জমা করিয়া অপরের ভাব প্রকাশের চেষ্টা নহে, ভাবিয়া-চিন্তিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া শব্দাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। যাহা দেখিয়াছেন, যাহা মনে উদয় হইয়াছে, তাহাই টুকিয়া রাখিয়াছেন। যে ভাষায় ভাবিয়াছেন, সেই ভাষাতেই লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাই বলিতেছি, তীর্থ-ভ্রমণের রচনা খাঁটি বাঙ্গালা। যাঁহারা খাঁটী বাঙ্গালা দেখিতে চান, তাঁহারা অবশ্য এক বার এই তীর্থ-ভ্রমণ পাঠ করিবেন। বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য অথবা সে কালের সাধু ভাষায় তীর্থ-ভ্রমণ বিরচিত হইয়াছে—ইহার বহু স্থানে বাঙ্গালী ভক্তের প্রকৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস পরিস্ফুট। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিজের রোজ-নামচা লিখিতে বসিয়া নিজের কোন কথাই

বাদ দিয়া যান নাই—তাঁহার হৃদয়ের সরলতার সঙ্গে যেন তাঁহার ভাষারও সরলতা প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি যে সময়ের লোকই হউন—তাঁহাতে সেই সময়ের কালধর্ম্মের ছাপ পড়িবেই পড়িবে—বিশেষতঃ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে! গ্রন্থকার এখনকার মত উচ্চ-ইংরাজী-শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার সময়ে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা থাকিলে শিষ্ট ও ভদ্র-সমাজে মান-সম্ভ্রম হইত, আমাদের গ্রন্থকারের তাহার অভাব ছিল না। তাঁহার বাল্যকালে উর্দ্দু ও পারসীর আলোচনা এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, ইংরাজী ভাষা সবে মাত্র প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার বাল্যকালে যাঁহারা কর্ত্তা ব্যক্তি ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উর্দ্দু বা পারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনিও নিজে একজন পারসীনবীশ। এখন যেমন সচরাচর কথা-বার্ত্তায় ১০টা বাঙ্গালার সঙ্গে ২টা ইংরাজী বুকনি বাহির হইয়া পড়ে, তৎকালে ভদ্র-সমাজে পারসী বা উর্দ্দু সেইরূপ ছিল;—আমাদের গ্রন্থকার তাহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই, এ কারণ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে—

সহরপানা, নহর, গলিজ, মুন্সী, নামদা, উঠায়গির, দফাদার, আন্ধার, আনোয়ার, গোবরের, মেহরাপ, তরন্দুর, সরহদ্দ, শিকিম, মাকুই, কুলপী, আবগারি, পরমিট, পঞ্জরা, কিনার, রেতী, মুরচা, মজবুদ, পোস্তা, পেলেখানা, হুকুম, মহলা, পারিদার, মদত-গিরি, বন্দুকচি, পানাপোস্তী, আমলদারি, মুহরি, মনলগ, লোকসান, কুতমুছরি ইত্যাদি শব্দ পাইতেছি। এ ছাড়া হিন্দী ভাষাও উপে-ক্ষিত ছিল না। তাহার ফলে অনেক স্থানে চাবেনা, চানা, ডাক, ঝাঁকি, বাদল, বিগড়া, পঙ্গ, ভেটিয়ারি প্রভৃতি শব্দ দেখিতেছি। তৎকালে ইংরাজী ভাষার প্রভাব ভদ্র-সমাজে অল্প অল্প প্রবেশ-

করিতেছিল—তাহার নিদর্শন—কন্সারন (Concern), মেগাজিন (Magazine), বারিক (Barrack) প্রভৃতি কএকটী শব্দে লক্ষ্য করিতেছি।

এ ছাড়া এখন যে সকল শব্দ ও পদ অসাধু ও ব্যাকরণদুষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তীর্থ-ভ্রমণ-রচনাকালে সেরূপ ছিল না। এ কারণ তীর্থ-ভ্রমণে ঔদাস্ততা, ঔষধি প্রভৃতি অপপ্রয়োগ দেখিতে পাই। অথচ গ্রন্থকার নিজে সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তীর্থ-ভ্রমণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা যে সংস্কৃত, হিন্দী বা পারসী ভাষা নহে, অথবা সংস্কৃত প্রভৃতি অপর কোন ভাষার নিয়মানুসারে এই ভাষাকে পরিচালিত করা চলে না বা উচিত নহে, তীর্থ-ভ্রমণকারের তাহা বেশ জানা ছিল। যে ভাষায় সহজ ও সোজা কথায় মনের ঠিক ভাব প্রকাশ করা যায়, অথচ ছোট-বড়, পণ্ডিত-মূর্খ কাহারও বুঝিতে কোন আয়াসের প্রয়োজন নাই, তাহাই প্রকৃত আদর্শ ভাষা। আমাদের গ্রন্থকার সেই আদর্শেই চলিয়াছেন—তাই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্যে রচিত না হইলেও তাঁহার এই রোজনামচা বা তীর্থ-ভ্রমণ বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অদ্বিতীয় ও প্রধান গ্রন্থের আসন অধিকার করিয়াছে।

গ্রন্থকারের কুল-পরিচয়

বাঙ্গালা ভাষায় যিনি এরূপ একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কুল-পরিচয় জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? অতি সংক্ষেপে তাঁহার কুল-পরিচয় দিতেছি।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলকারিকায় বসুবংশের পরিচয়-প্রসঙ্গে সর্ব্ব-প্রথমেই সর্ব্বাধিকারিবংশের এইরূপ কুল-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"দশরথবসুজাতঃ শ্রীলকৃষ্ণো বিরেজে
সমজনি ভবনামা তৎসুতঃ শুদ্ধচেতাঃ।
প্রকৃতসলিলমধ্যে হংসনামা সুতেজ
ভবসুত ইহ লোকে তৎসুতাঃ শুক্তিকাখ্যাঃ॥
বাগাণ্ডাসমাখ্যং গতঃ শুক্তিনামা
ততো মাহিপুর্য্যাং যযৌ মুক্তিকঃ সন্।
সুতেজাঃ সুধীঃ সৎকৃতী বঙ্গদেশং
ব্রজ নরস্বগঙ্কার নামা বিরেজে॥
অভূমুক্তিকাৎ শ্রীলদামোদরাখ্য-
স্ততো অজে বানন্তকঃ শুদ্ধচেতাঃ।
যতশ্চাধিবাসী গুণানন্দমুখ্য-
স্ততো মাধবস্তৎসুতা লক্ষ্মণাখ্যাঃ॥
বসুর্ল ক্ষ্মণশ্চক্রপাণির্ম হাত্মা
তথৈবোদয়নস্ততো বিরেজে।
ততঃ শ্রীপতিশ্চাচ্যুতো ভূরিতেজাঃ
সুতা রামস্ত ক্ষিতৌ সুপ্রতিষ্ঠাঃ॥
আদৌ লক্ষ্মণকর্ম্মহীপতিবসুঃ পঞ্চাননোঽভূম্মহান্
তৎপশ্চাৎ কুলকীর্ত্তিবিত্তবিপুলো নারায়ণাখ্যঃ সুধীঃ।
খ্যাতঃ শ্রীবিজয়শ্রিয়ং ধরতি যো লম্বোদরোঽভূস্তত-
স্তৎপশ্চাদ্ধরিসংজ্ঞকৌ বিজয়তে সর্ব্বেশ্বরো মৃত্যুকঃ॥
সুরেশো বসুর্ব্বিষ্ণুরীশাননামা ততো বিপ্রনাথঃ ক্ষিতৌ শুদ্ধধামা॥

ততো দাসকঃ সর্ব্বগঙ্গাধরৌ তৌ
তগীপারবেশৌ মহীশো দ্বিরেজঃ।
বসুর্বিশ্বনাথস্ততো লোকনাথঃ
ককুস্থঃ সুবেশাদ্বপুঃ সাধুশীলঃ॥
জনমেজয়ো বসু চতুর্ভুজনামধেয়ো
দেবানন্দ ইহ বিশ্বসুতাত্রয়োঽমী।
শ্রীমাধবঃ কিল মুকুন্দ উদারকীর্ত্তি-
র্জাতাস্ততোঽচ্যুতরঘুজন্মেজয়াখ্যাঃ॥
মাধবস্ত তনয়া ইমে বসুর্যাদবো হি কিল গোপীকান্তকঃ।
জীবনঃ স হি বিরাজতে স্বয়ং সাধুশীলবসুবংশদীপকঃ॥
যাদবাদজনি কৃষ্ণদাসকঃ শ্রীরাম ইহ যস্ত দেহজঃ।
শ্রীরামস্ত তনু······বাং সুকৃতিনো রত্নেশ্বরাজ্জজ্ঞিরে॥
বিশ্বেশঃ কিল প্রাণবল্লভবসুর্জ্জাতস্ততো জীবনঃ
তৎপশ্চাৎ ব্রজবল্লভঃ সুবিদিতঃ কাশীজগন্নাথকৌ।
খ্যাতস্তত্র ধনঞ্জয়ো বসুবরো লক্ষ্মীশঃ গোপীপরাঃ
বসুবরো বিদিতঃ কালিকিঙ্করকুলবরো ধরণীশ্বরসাদরঃ॥
তদঙ্গজো হি নটেন্দ্রগুণেন্দ্রপরঃ কৃতিনা বিমুখৌ বসুবিশ্বসুতৌ
নিত্যানন্দঃ কিল মুখবর্য্যো রামাদিনন্দঃ সুতদানশৌর্য্যঃ॥
তস্মাত্মজৈঃ সেবকরামধন্যো গ্রহাৎ কুলে বর্দ্ধিতমুখ্যসংজ্ঞঃ।
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজচিত্তভৃঙ্গাঃ সুতা বভূবুঃ কিল কিঙ্করস্ত॥"

উক্ত কুলকারিকা অনুসারে এইরূপ বংশলতা পাইতেছি,—

- ১ দশরথ বসু
  - ২ শ্রীকৃষ্ণ
    - ৩ ভব
      - ৪ হংস
        - ৫ শুক্তি (বাগাণ্ডা)
        - মুক্তি (মাহীনগর)
          - ৬ দামোদর
            - ৭ অনন্ত
              - ৮ গুণানন্দ
                - ৯ মাধব
                  - ১০ লক্ষ্মণ
                    - ১১ মহীপতি
                      - ১২ সুরেশ
                        - ১৩ বিশ্বনাথ
                          - ১৪ জনমেজয়
                            - ১৫ মাধব
                              - ১৬ যাদব
                                - ১৭ শ্রীকৃষ্ণদাস
                              - গোপীকান্ত
                              - জীবন
                            - অচ্যুত
                            - রঘু
                          - চতুর্ভুজ
                          - দেবানন্দ
                        - লোকনাথ
                      - বিষ্ণু
                      - ঈশান
                        - গোবিন্দ গন্ধর্ব্বখাঁ
                        - গোপীনাথ পুরন্দরখাঁ
                        - বল্লভ সুন্দরবরখাঁ
                      - বিঘ্ননায়ক
                      - গঙ্গাধর
                      - ভগীরথ
                    - পঞ্চানন
                    - নারায়ণ
                    - লম্বোদর
                    - হরি
                    - গর্ভেশ্বর
                  - রাম
        - অলঙ্কার (বঙ্গ)

১৭ কৃষ্ণদাস
|
১৮ শ্রীরাম সর্ব্বাধিকারী
|
১৯ রত্নেশ্বর
|
২০ বিশ্বেশ্বর, প্রাণবল্লভ, জীবন, ব্রজবল্লভ, কাশী, জগন্নাথ প্রভৃতি
|
(বিশ্বেশ্বর) — ২১ কিঙ্কর, নটেন্দ্র, গুণেন্দ্র
|
(কিঙ্কর) — ২২ নিত্যানন্দ, রামানন্দ, সেবকরাম
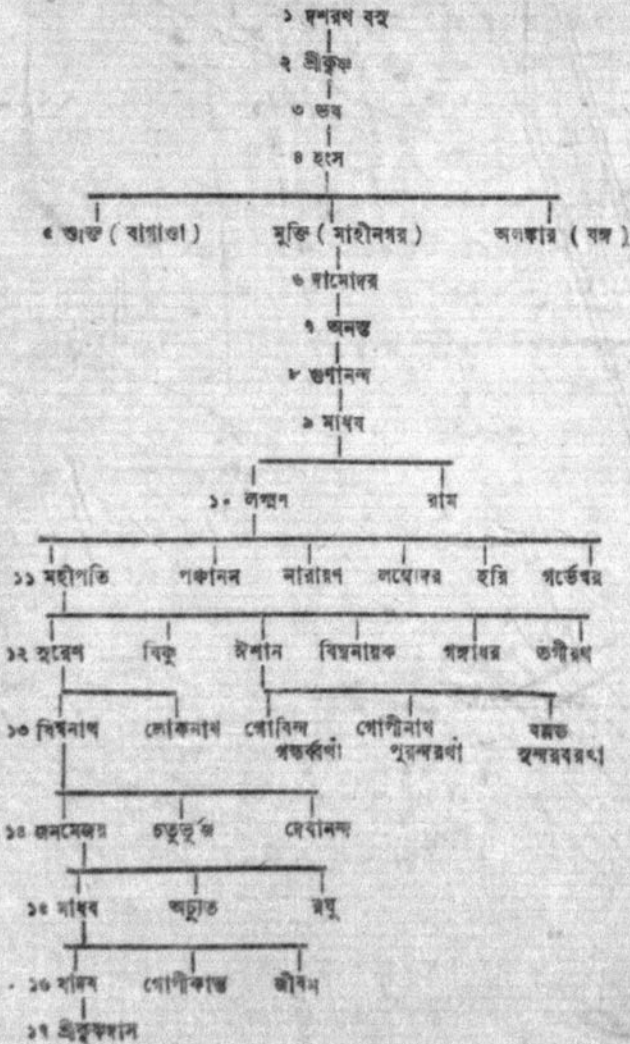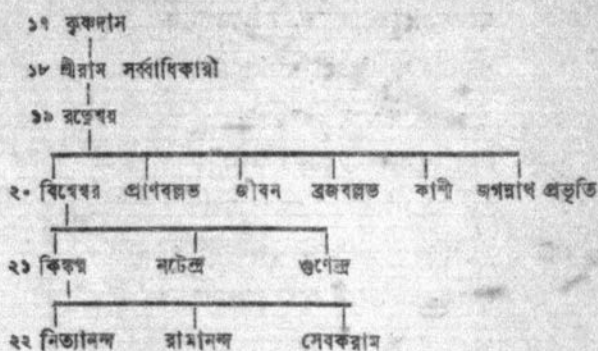
উপরোক্ত কুলকারিকারও কিছু পূর্ব্বে সঙ্কলিত দক্ষিণরাঢ়ীয় সমীকরণকারিকায় এই সর্ব্বাধিকারিকুলের এইরূপ বংশ ও অংশ নির্ণীত হইয়াছে ;—

"অথ মাহিনগরস্ত মুখ্যাদীনাং সমীকরণং

১৩। বসুবিশ্বনাথঃ সুতাসম্প্রদানাৎ
বিরেজে নৃসিংহাত্মজে মিত্রবর্য্যে।
গৃহাৎ সোঽপি লব্ধা শিবস্যাপি কন্যাং
ন রেজে চ মুখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ ॥

১৪। তৎসুত-জনমেজয়-বসোঃ কুলং—

বসুঃ সোঽপি জনমেজয়াপ্যঙ্ক দানং
দদৌ গোপীঘোষে গণেশে চ ঘোষে।
ততঃ সোঽপি লেভে মুদং দেবরাজে
ততশ্চৈব পীতাম্বরে মুখ্যবর্য্যঃ ॥
ত্রিগো চাপি মিত্রে মুদং দত্তকন্তো
গুণং যশ্চ লেভে মহেশে চ ঘোষে।
ততঃ সোঽপি দেবীবরাখ্যে চ শাস্তে
গৃহীত্বা চ দেবেশকং ঘোষসিংহং ॥

গণেশস্য সুতাং গৃহ্নন্ পীতাম্বরতনূদ্ভবাং।
কংসারিতনয়াং লব্ধ্বা নবরঙ্গগুণং যযৌ॥

১৫। তৎসুতমাধববসোঃ কুলং—
বিরেজে বসুর্মাধবাখ্যশ্চ মুখ্যঃ
প্রদানাঃ সুখ্যো গুণী কেশবাখ্যো।
ততো বাসুদেবে বভৌ কৈবল্যাখ্যো
সুদং সোপি লেভে যশো বাসুদেবে॥
ন তোষং প্রপেদে যদ্‌ঘোষবর্য্যো
গৃহীত্বা স্বনন্তং ততো মাধবঞ্চ।
ততো বল্লভং নো বিরেজে চ ঘোষ
সুমুখ্যঃ সুধীরস্ততো গৌরীঘোষঃ॥

১৬। তৎসুতযাদববসোঃ কুলং—
বসুর্যাদবাখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ
সুশীলঃ সুধীরঃ ক্ষিতৌ সুপ্রতিষ্ঠঃ।
বভৌ ঘোষবর্য্যো ভৃশং রামভদ্রে
প্রাণাচ্চ লেভে ততো গৌরঘোষং॥
জগন্নাথকং শ্রীলবংশক মিত্রং
গৃহীত্বা চ কামং ক্ষিতৌ মিত্রবর্য্যাং।
ততো যাদবং যো দ্বিতীয়েন লব্ধ্বা
মুদং সোপি লেভে তৃতীয়েন কোপি॥

১৭। তৎসুত-কৃষ্ণদাস-বসোঃ কুলং—
বসুকৃষ্ণদাসো মুদং দীপ্যমানঃ
প্রদানাদ্বিলেভে রযৌ ঘোষবর্য্যো।

মৃতোঽহসৌ ন রেজে যদৌ ঘোষকে চ
প্রগৃহ্য প্রধানঃ রতিকান্তঘোষঃ ॥

১৮। তৎসুত-শ্রীরামবসোঃ কুলং—

শ্রীরামো বসুপুঙ্গবো হৃহিতরং শ্রীশম্ভুঘোষাত্মজে
দত্বাৎ শ্রীহরিমিত্রজে গুণযুতে গোপ্যাদিকান্তাত্মজে।
হর্ষং নৈব যযৌ যতঃ প্রকৃতকোপ্যাদানাদ্‌যো হ্যঙ্গে
সোপি চ শম্ভুঘোষমগমৎ সর্ব্বাধিকারী মহান্ ॥

১৯। বসুঃ সোপি রত্নেশ্বরো মুখ্যবর্য্যঃ
প্রদানাত্তুরেজে ক্ষিতৌ বিশ্বনাথে।
শিবেশৌ মুদং নো বিলেভে চ মিত্রে
ততো ভূরিতেজাঃ পদৌ ঘোষবর্য্যো ॥
যযৌ সোপি ঘোষজনারিক্ষ দানাৎ
গৃহীত্বা'ন তুষ্টিং গতঃ শ্রীলরামঃ।
ততোরং লভেযে শিবে চিত্ররাজে
পুত্রৌ যো বিলজ্জো বনে ঘোষকে চ ॥

২০। তৎসুত-বিশ্বেশ্বরবসোঃ কুলং—

মুখ্যং শ্রীবুতবিশ্বনাথ উদিতঃ সর্ব্বাধিকারী সুধীঃ
দানেনৈব কুলোদ্ভবং কৃত্তিবরং সংপ্রাপ্য গঙ্গাধরং।
তৎপশ্চাদ্রঘুরামকং কুলভবং লব্ধা ন তোষং গতো-
প্যাদানাত্তু ভাষতে বিধিবশাদ্রামাদিনন্দো মহান্ ॥
দ্বিতীয়ং গ্রহণং চক্রে মিত্ররত্নেশ্বরঃ পুনঃ।
মুখ্যশ্রেষ্ঠোঽপি বিশ্বেশো হ্যঙ্গেনৈব গুণং যযৌ ॥

২১। তৎসুতকিঙ্কর অধিকারীবসোঃ কুলং—

কুলে মহান্ শ্রীকিলকিঙ্করোঽসৌ
দানেন লব্ধ্বা মধুসূদনঞ্চ।
স্নোহঞ্চ লেভে কিল মুখ্যবর্য্যো
মহাদিদেবে রঘুদেবকে চ॥
মিত্রে ঘনশ্যামসুতে প্রদানাৎ
জগ্রাহ কৃষ্ণং স তু কোমলঞ্চ।
শ্রেণীবিভঙ্গেন বিহীনতেজা
ব্রবীমি কিং তস্য কুলস্য শোভাম্॥

প্রাচীন কুলকারিকা হইতে সর্ব্বাধিকারি-বংশের পরিচয় উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে বসুবংশের মধ্যে প্রথম হইতে এই বংশই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন, তাই এই বংশের কুলপরিচয় সর্ব্বাগ্রে বিবৃত হইয়াছে। এই বংশের যাঁহারা আধুনিক ইতিহাস লিখিয়াছেন—তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ১২শ পর্য্যায়ে মহীপতির পুত্র সুরেশ বা সুরেশ্বরই মুসলমান অধিপতির নিকট হইতে "সর্ব্বাধিকারী" এই বংশগত উপাধি লাভ করেন। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি দেওয়া হয় নাই। তৎপুত্র বিশ্বনাথ কুলগ্রন্থে প্রকৃতরাজ বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইলেও কোথাও তিনি 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। তাঁহা হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ কৃষ্ণদাস বসুই প্রথম সর্ব্বাধিকারী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

উক্ত সুরেশ্বর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীনাথ পুরন্দর খাঁ গৌড়াধিপ সুলতান হোসেনশাহের রাজস্ব-মন্ত্রী (Finance minister)

ছিলেন। তিনিই ধনে মানে, কুলে-শীলে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে সর্ব্বপ্রথম সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি হইয়া ১৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই করেন, ইহাই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে ১ম একজাই বলিয়া পরিচিত। এই ১ম একজাই-সভায় সুরেশ্বর বসুর পুত্র বিশ্বনাথ বসুই বসুবংশের প্রকৃতরাজ বলিয়া বসুবংশীয় কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মালাচন্দন পাইয়াছিলেন, তৎপরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে যত বার একজাই হইয়াছে, প্রত্যেক বারই বসুবংশের মধ্যে বিশ্বনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ বংশধরমাত্রেই প্রথম মালাচন্দন পাইয়া আসিয়াছেন।

সর্ব্বাধিকারী উপাধির সহিত শ্রেষ্ঠ কুল-মর্য্যাদার কোন সম্পর্ক নাই। অনেকের বিশ্বাস যে, এই বংশ দিল্লীর পাঠান বাদশাহ মহম্মদ তোগলকের অধীনে উড়িষ্যার দেওয়ানী বা শাসনকর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাহা হইতেই 'সর্ব্বাধিকারী' এই শ্রেষ্ঠ উপাধি-প্রাপ্তি ঘটে। তখনকার উপাধি অনেকটা বংশগত হইত এবং উপাধি-দানেরও বিশেষত্ব ছিল যে, উপাধির সঙ্গে সঙ্গে পদোচিত মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্ত উপযুক্ত ভূসম্পত্তিও দেওয়া হইত। সুতরাং উপাধিলাভের সহিত বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের (উড়িষ্যার অন্তর্গত) রঘুনাথপুর পরগণাও উপহার পাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, এই বংশের সুরেশ্বর বসুই প্রথম 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি ও রঘুনাথপুর পরগণা জায়গীর পান। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে কোন মুসলমান-নৃপতি উড়িষ্যায় স্থায়ী শাসনাধিকার বিস্তারে সমর্থ হন নাই। বলিতে কি, মহম্মদ তোগ-

শকের সময়েই পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বঙ্গদেশেই যাঁহার শাসনাধিকার লোপ পাইয়াছিল, তৎকর্ত্তৃক উৎকলে শাসন-কর্ত্তৃত্ব উপলক্ষে উপাধি ও জায়গীর দান কখনই সম্ভবপর নহে। পুরন্দর খাঁ সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজস্ব-সচিব ছিলেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান হোসেনের অভ্যুদয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সুরেশ্বর বসু পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। আলাউদ্দীনের ১৭৩ বর্ষ পূর্ব্বে মহম্মদ তোগলকের সিংহাসন-লাভ। এরূপ স্থলে হোসেন শাহের সমসাময়িক পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠতাত সুরেশ্বর কখনই মহম্মদ তোগলকের সমসাময়িক হইতে পারেন না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কুলগ্রন্থসমূহে সুরেশ্বর হইতে তাঁহার ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন শ্রীরাম পর্য্যন্ত প্রকৃতরাজ বলিয়া সম্মানিত হইলেও কেবল 'বসু' উপাধিতেই ভূষিত ছিলেন। শ্রীরাম বসু হইতেই 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধির প্রকাশ এবং তৎপুত্র রত্নেশ্বর হইতে পরবর্ত্তী সকল বংশধরই 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষে বা ১৮শ শতকের কোন সময়ে এই বংশ 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি লাভ করেন। আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে পাইতেছি, ১৮শ পর্য্যায়ে শ্রীরাম সর্ব্বাধিকারী প্রিয় পুত্র রত্নেশ্বরের আদ্যরসে বিবাহ দিয়া উৎকলবাসী মিত্রবংশীয় মোহনরায়ের কন্যা গ্রহণ করেন অর্থাৎ মোহনরায় রত্নেশ্বরের সহিত আদ্যরসে আপনার একমাত্র কন্যার বিবাহ দেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে সমাজপতি, দলপতি বা ধনশালী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ আদ্যরসে কন্যাদান অতিগৌরব ও সম্মানজনক মনে করিতেন।

এরূপস্থলে কন্যার পিতাকে যথেষ্ট ব্যয়ভার বহন করিতে হইত এবং পাত্রপক্ষের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সম্পত্তি-লাভের সম্ভাবনা ছিল। এ কারণ যে সে ব্যক্তি আত্মরসে কন্যাদান করিতে পারিতেন না। বসুবংশের প্রকৃতরাজ রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারীকে আত্মরসে কন্যাদান করাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার শ্বশুর মোহন রায় উৎকলবাসী হইলেও মান্য-গণ্য অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কুলগ্রন্থে এই বৈবাহিক-সূত্রেই শ্রীরাম সর্ব্বাধিকারীর আমরা উৎকল-সংস্রব পাইয়াছি। রত্নেশ্বর একজন ভগবদ্ভক্ত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তি ও দানশীলতার জন্য তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেন, সেই সঙ্গে আর একটি বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের মাথায় ছাতা ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এদিকে এই বংশের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারীই সর্ব্বপ্রথম কটক জেলা হইতে হুগলীজেলাস্থ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে পাইতেছি যে, রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বেশ্বর (খানাকুল) কৃষ্ণনগরের জমিদার সিংহবংশীয় কিশোর রায়ের কন্যাকে আত্মরসে বিবাহ করেন। সর্ব্বাধিকারি-বংশে প্রবাদ আছে যে, স্থানীয় জমিদার রায়চৌধুরী-বংশের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রেই তাঁহারা এখানকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। তখন খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি। রায়বংশ এখানকার সমাজপতি ছিলেন—কিন্তু প্রকৃতরাজ বিশ্বেশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া তাঁহারা সমধিক সম্মানিত হন এবং বহু সম্পত্তি দিয়া এখানে সর্ব্বাধিকারি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সে কালে আত্তয়সে কন্যাদান অতি গৌরব-জনক ও শ্লাঘার বিষয় ছিল। সুতরাং তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে ধনে-মানে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারাই আত্তয়সে কন্যাদান করিবার জন্ত ব্যগ্র হইতেন। রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারী ও তাঁহার বংশ তৎকালে কুল-মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার বংশধর-মধ্যে আত্তয়ন করিবার জন্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী ধনকুবের কায়স্থমাত্রেরই আগ্রহ ছিল, তাহার ফলে উপযুক্ত কুলকার্য্য ব্যতীত দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও মানীর ঘরে তাঁহাদের আত্তয়ন হইয়াছিল, কুলপঞ্জিকা হইতেই আমরা তাহার পরিচয় পাই। যথা—দশঘরার গোষ্ঠিপতি পালবংশীয় মাধব রায় বিশ্বেশ্বরের পুত্র কিঙ্কর সর্ব্বাধিকারীকে, আম্বুয়ালের বিজয়রাম হালদার কিঙ্করের পুত্র নিত্যানন্দ সর্ব্বাধিকারীকে, ভালুকার দেওয়ান রামনৃসিংহ সিংহ নিত্যানন্দের পৌত্র প্রকৃত-রাজ রাজনারায়ণ সর্ব্বাধিকারীকে ও রায়েরকাটির প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজনারায়ণের পৌত্র শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারীকে স্ব স্ব-কন্যা এবং শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর শ্রীনাথের পুত্র রাধানাথ সর্ব্বাধিকারীকে আপন পৌত্রী (কুমার মহেন্দ্রনারায়ণ দেবের কন্যা) দান করিয়াছিলেন।

এই বংশের জ্যেষ্ঠ যে কেবল প্রকৃতরাজ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় গোষ্ঠিপতি, সমাজপতি, দলপতি এবং প্রত্যেক সম্মৌলিকের নিকট দেববৎ পূজা পাইতেন। এখনও সে সম্মান একবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

কিঙ্কর বা কালিকিঙ্কর সর্ব্বাধিকারীর চারি পুত্র—নিত্যানন্দ,

রামানন্দ, সেবকরাম ও তিলকরাম। নিত্যানন্দের তিন পুত্র—জনমেজয়, প্রতাপনারায়ণ ও রামনারায়ণ। মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী সংস্কৃত ও পারসীভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিস্তর বালকের বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতেন, বিদ্যা-প্রচারের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তাঁহার রাধানগর ও খিদিরপুরের বাটী বিদ্যার্থী ও বিদ্যোৎসাহিগণের সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল। তাঁহার খুল্লতাতপুত্র হরিপ্রসাদ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বাঙ্গালা দেশস্থ সমুদায় রেশমের কারবারের দেওয়ান ছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালার রেশম-কুঠীর উপর অসাধারণ প্রভুত্ব হেতু তিনি "রাজা হরিপ্রসাদ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

মুন্সী রামনারায়ণের সহিত তাঁহার স্বগ্রামবাসী রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায়ের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল।

রামনারায়ণ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া অনেক চেষ্টায় "নবরত্নের" কুণ করেন অর্থাৎ পুত্র-কন্যা ৯টিকে পর্য্যায়ক্রমে উপযুক্ত কুলীন পাত্রী ও পাত্রে বিবাহ দিয়া আপনার কুলের বিশেষ গৌরবসাধন করেন। তিনি আপনার চেষ্টায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া-ছিলেন। কথিত আছে, খাজনার টাকা কিছু কম থাকাতে রাম-নারায়ণ পুত্র মদনমোহনকে অর্থ সংগ্রহ করিতে বলেন। মদনমোহন নিজে টাকার জোগাড় না করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে আনিয়া দেন এবং পিতার নিকট তাহা উল্লেখ করেন। উপযুক্ত পুত্র অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিবার উপায় সত্ত্বেও বৈবাহিকের নিকট ঋণ করিয়াছে বলিয়া খাজনার টাকা খাজনা-ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া রামনারায়ণ তাহার চাবি পুষ্করে ফেলিয়া দেন। পুত্রকে অনুমতি করেন যে, চাবি খুলিয়া অগ্রে তাঁহার শ্বশুরের টাকা যেন প্রত্যর্পণ

করা হয়, এরূপ অবস্থায় বিষয়রক্ষা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহনের উপর রাগ করিয়া কটক জেলার রঘুনাথপুর ও অন্যান্য অধিকাংশ সম্পত্তির রাজস্ব না দিয়া লাটে চড়াইয়া বিক্রয় করাইয়া দেন।

রামনারায়ণ আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া "মুন্সী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কলিকাতার নিকটস্থ খিদিরপুরে অনেক বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছিলেন এবং খিদিরপুরে "মুন্সীর-বাগান" ও "মুন্সী-বাড়ী" অদ্যাপি তাঁহার নামেই পরিচিত। ওয়াট্‌গঞ্জের নিকট অনেক জমি সরকারি রাস্তা প্রস্তুতের জন্য গভর্ণমেণ্টকে দান করেন। তাহা এক্ষণে 'মুন্সীগঞ্জ রোড' নামে খ্যাত। তিনি যে নবরঙ্গকুল করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার এক কন্যার সহিত হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্‌ শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ মিত্রের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়।

মুন্সী রামনারায়ণ পিতার তৃতীয় সন্তান, সুতরাং প্রকৃত মুখ্য-ভাবাপন্ন না হইলেও নবরঙ্গকুল করিয়া তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে কোমল-মুখ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—মদনমোহন, মথুরামোহন, শ্যামামোহন ও গুরুদাস। মদনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী বড়লাটের দেওয়ান ও পরে মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম হুমায়ুন জার দেওয়ান হইয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। মদনমোহনের অনুজ মথুরা-মোহন সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠপুত্র হইতেছেন —আমাদের তীর্থ-ভ্রমণ-রচয়িতা অনামধন্য যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

[পর পৃষ্ঠায় ইঁহাদের বংশলতা উদ্ধৃত হইল।

২২শ পর্য্যায়ে নিত্যানন্দ
২২ রামানন্দ
রামকান্ত
রাজা হরিপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
২৩ জনমেজয়
প্রতাপনারায়ণ
রামনারায়ণ (নবরত্নী)
২৪ রাজনারায়ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
২৫ শ্রীনাথ
নবীন
ভৈরব
গিরিশ
২৪ মদনমোহন
মথুরামোহন
গোপীমোহন
শ্যাম
শুরুদাস
২৫ রাজা সীতারাম
২৫ যদুনাথ
বৈকুণ্ঠনাথ
ব্রজনাথ
কেদারনাথ (জীবিত)
২৬ রাধানাথ
দীননাথ
কৃষ্ণনাথ
২৭ রমানাথ
২৮ সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি (প্রকৃত)
২৬ প্রসন্নকুমার
সূর্য্যকুমার
আনন্দকুমার
রাজকুমার
অক্ষয়কুমার
অমৃতকুমার
অনন্ত
উপেন্দ্র
২৭ সত্যপ্রসাদ
ডাঃ দেবপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
ডাঃ সুরেশপ্রসাদ
নগেন্দ্রপ্রসাদ
বিনয়প্রসাদ
মণীন্দ্রপ্রসাদ
সুশীলপ্রসাদ

গ্রন্থকারের পরিচয়

বাঙ্গালার সুসন্তান রাজা রামমোহন রায় যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন, সেই রাধানগর গ্রামেই রাজা সীতানাথ ও তাঁহার খুড়াত ভাই যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এখন রাধানগর জেলা হুগলী, আরামবাগ সব্‌ডিভিজান, থানা খানাকুলের অধীন একটি সামান্য ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত। এখন সামান্য হইলেও এক সময় এই স্থান খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য ছিল। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিতেন, চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় সকলই ছিল। এখানে রাস, দোল প্রভৃতি উৎসবে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইত। ৺সরস্বতী পূজার ধূমধামের সীমা থাকিত না। এসময় এখানে যেরূপ সোলার পুতুল ও মাটীর পুতুল প্রস্তুত হইত, তাহাতে নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের কারিকরদিগকেও হারাইত। এখানকার স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল যে, কলিকাতা হইতে অনেক বড়লোক সখ করিয়া রাধানগরে বেড়াইতে যাইতেন। কিন্তু পঞ্চাশ বর্ষ মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে রাধানগর উৎসন্ন গিয়াছে, এখন জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি রাজা রামমোহন রায় ও ভক্ত যদুনাথের জন্মভূমি বলিয়া রাধানগর আমাদের নিকট পুণ্যভূমি! এই রাধানগরের বক্ষ-বিধৌত নদীর অপর পার্শ্বেই কৃষ্ণনগর গ্রাম—সুপ্রসিদ্ধ অভিরাম গোস্বামীর পাট। এই অভিরাম গোস্বামীর পাট আছে বলিয়া, আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে এই স্থান পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের প্রায় ত্রিশবর্ষ পরে বাঙ্গালা ১২১২ সালে (১৮০৫ খৃষ্টাব্দে) যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে

রাধানগরের উজ্জ্বল অবস্থা। দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে তিনি উপযুক্তরূপে পারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতার সময় হইতেই জমিদারী নিলাম হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা কিছু হীন হইয়া পড়ে। তথাপি যদুনাথ সে সময়ের উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন নাই।

তাঁহার দুই বিবাহ—প্রথম বিবাহ রাধানগরের পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর গ্রামে গোপীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত হয়। এই প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণের নাম—প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দকুমার ও রাজকুমার। তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ—হুগলীর গুড়োপ গ্রামে প্রসিদ্ধ নাগবংশীয় জমিদারবাড়ী। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভেও তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রগণের নাম—অক্ষয়কুমার, অমৃতকুমার, অনন্তকুমার ও উপেন্দ্রকুমার। যদুনাথ মধ্যমাকৃতি ছিলেন, মুখে যেন গাম্ভীর্য্য, স্বাধীনতা, দয়া ও মমতা মাখান ছিল। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, তীর্থযাত্রা করিবার বা ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মুখের ভাব কি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিল, যেমন চোখ, তেমনি নাক—তেমনি কপালাদি। তাঁহার সেই মুখশ্রী তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে বিরল নহে। তাঁহার ৫ম পুত্র উকীল অমৃতকুমার এমনি সুপুরুষ ছিলেন যে, আলিপুরের জজকোর্টে যখন তিনি ওকালতি করিতেন, তখন বিচারক অনেক সময় বলিতেন—"সুপুরুষ উকীলের মুখে যদি ওজস্বিনী ভাষা নির্গত হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই জয়লাভের সম্ভাবনা।"

যদুনাথের যেমন সুন্দর গঠন আবার তাহার উপর সেইরূপ

বলিষ্ঠকায় পুরুষের সকল লক্ষণই বিদ্যমান ছিল। দীর্ঘকাল শূল-রোগে কাতর থাকিলেও তিনি যে কিরূপ কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন, তাহা তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ। তাঁহার বংশধরগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একটী আস্ত আধমণী কাঁঠাল অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে পারিতেন। আবার এমন দিন গিয়াছে, অম্লশূলের যাতনায় খানিকটা জলও তাঁহার পেটে তলায় নাই।

অম্লশূল-রোগে তিনি বহুকাল কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন ৪৭ বর্ষ—তাঁহার পুত্রগণের মধ্যেও যে সময় কেহ কেহ উপযুক্ত হইয়াছেন, এই সময়ে তাঁহার অম্লশূল রোগ কিছু বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছিল। গ্রন্থকার সেই দারুণ অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগের পরিচয় নিজেই এইরূপ দিয়া গিয়াছেন, "সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাহাতে আমার অম্বলের ব্যামোহ হইয়া শূল উপস্থিত হইল, শূল-ব্যাধির যেমত যাতনা তাহার কিছু ন্যূন ছিল না। এক এক দিবস যাতনাতে এমত মনে হইত যে, আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। ভগবৎযেচ্ছায় নিবারণ হইত। ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্ব্বল এবং আহার রহিত হইল। এক রাত্রে ঘরে শয়নে ছিলাম, ইতি-মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া বেদনায় সূত্র হইতে উঠিয়া এক গেলাস জল পান করিলাম, তাহাতে নিবৃত্তি না পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় যাতনা হইতে লাগিল। সে যাতনার কথা যখন মনে হয়, তখন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। হে ভগবান্! তেমন যাতনা যেন কাহার না হয়। সেই যাতনাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ব্যাকুল হই। গৃহমধ্যে আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রগণ লইয়া শয্যান্তরে শয়নে ছিল। আমি তিন চারিবার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, তাহাতে রোগ-

যন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়া অত্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হইয়া আর কাহাকে কিছু না কহিয়া 'স্ত্রীপরিবার সকলি বৃথা, সম্বন্ধ জীবনাবধি; এই মনে স্থির করিয়া চণ্ডালগ্রস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ প্রধানকল্প বিবেচনা করিয়া ঘর হইতে বাহির হই। বাহির বাটীতে আসিয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রী৺রাধাকান্তদেব ঠাকুরের শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিলাম। ক্ষণেককাল বসিয়া থাকিতে বেদনায় কিছু শান্তি বোধ হইয়া তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তৎকালে রাত্র তৃতীয় প্রহর গত, নিদ্রাবেশে হস্ত মস্তকে দিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়ন করিয়া মনে উদয় হইতে লাগিল যে, মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসার-কূপ-নরকে ডুবিয়া কেবল আমার আমার করিয়া সৃজনকর্ত্তা জগদীশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া এত ক্লেশ পাইতে হইতেছে। হে জগদীশ্বর! আমার শরীরে কিছু বল হইলে আমি স্ত্রীপুত্রের মায়া ছেদ করিয়া তোমার দর্শনাশে দেশ ভ্রমণ করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাকর্ষণ হইল।"

যদুনাথের নিজের কথায় তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি। প্রথম রোগের যন্ত্রণা, তৎপরে ডাকাডাকি করাতেও কনিষ্ঠা পত্নীর না উঠা। একারণ তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সংসারের উপর ঘৃণা এবং জীবনের উপর মমতাহীন হইয়া আত্ম-হত্যার সঙ্কল্প। কিন্তু ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। ভক্ত যদুনাথ তাঁহার চির-আরাধ্য রাধাকান্তের শ্রীমন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র—সম্ভবতঃ তাঁহার মোহ দূর হইয়াছিল—আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ভগবান্ রাধাকান্তই তাঁহাকে সে প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। তবে যে কয় দিন চলা-ফেরা করিবার উপযুক্ত শক্তি না হইয়াছিল, সে কয়

দিন তাঁহাকে ঘরেই থাকিতে হইল—তৎপরে এক বর্ষকাল তিনি কিরূপে কাটাইয়াছিলেন, তাঁহার তীর্থ-যাত্রার প্রারম্ভেই সে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই এক বর্ষ অতি কষ্টে তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার কএক দিন পরে তাঁহার প্রাণতুল্য জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বাড়ী আসিলেন এবং সাত দিন বাটীতে থাকিয়া পিতার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতার বহুবাজারের বাসায় আনিলেন। অনেক ভাল ডাক্তার দেখিলেন। অবশেষে রিশড়া-নিবাসী চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের সুচিকিৎসার গুণে রোগের কতকটা উপশম হইল। চিকিৎসকের ব্যবস্থা হইল—যতটা পারেন প্রত্যহ তাঁহাকে পদব্রজে হাঁটিতে হইবে। কিন্তু এ সময় তিনি বড় দুর্ব্বল, তিনি নিজেই জানাইয়াছেন—"বহুবাজার হৃদয়রাম বাঁড়ুজ্যের বৈঠকখানা হইতে বাজার পর্য্যন্ত আসিতে এত ক্লেশ বোধ হইল যে, ক্রন্দন করিলাম। পর দিবস মলঙ্গার গোলপুষ্করিণীর ধারে ঐ মত ক্লেশ। * * আমি এত দুর্ব্বল যে, একবার প্রদক্ষিণ করিতে চারিদিকে চারিবার বসিয়া শ্রম দূর করিতে হয়। এই মত সপ্তাহ করিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণের ক্ষমতা এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া দিবাতে অন্ন ও রাত্রে সুজির রুটি পরিপাক হইল। ক্রমে বল ও আহারের বৃদ্ধি হইয়া প্রায় বার আনা ব্যাধির উপশম হইল, রোগের শেষ হয় নাই।"

ইহার কিছু দিন পরে ফাল্গুন মাসে ভবানীপুর মোকামে তাঁহার ৩য় পুত্র আনন্দকুমারের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল। চৈত্রমাসে যদুনাথ রাধানগরের বাটীতে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তাঁহার আদৌ ভাল

লাগিল না। নিয়মমত শয়ন ভোজন করেন, তথাচ কসুর মেটে না। ঔষধ সেবনকালে ভাল থাকেন, ঔষধ ছাড়িলেই আবার রোগ হয়। "পূর্ব্ব ঔদাস্ত মনে আছে।" আশ্বিন মাসে ৺পূজার ছুটীতে সকল পুত্র বাটী আসিলেন। তাঁহার মনের চাঞ্চল্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার জিজ্ঞাসা করেন, "সর্ব্বদা কি জন্ম অন্ত মন আছেন।" যদুনাথ আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন; শেষে খুলিয়া বলিলেন যে "৩২৲ টাকা হইলে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারি।" সেই দিনই তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল।

এই সামান্ত অর্থ লইয়া কিরূপে তখনকার দিনে পদব্রজে সুদূর বৃন্দাবনে যাইবেন, তাহারই পরীক্ষা হইল। "৺তারকেশ্বরের তাগা নিয়মপূর্ব্বক ধারণ করাতে ব্যামোহ কিছুমাত্র ছিল না।" যদুনাথ তারকেশ্বর হইতে পদব্রজে অক্লেশে রাধানগরের বাটীতে আসিলেন।

যদুনাথের দৈনন্দিন-লিপি হইতেই বুঝিতেছি যে দেবতার উপর তাঁহার অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, সেই ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে তাঁহার কুলদেবতা রাধাকান্ত তাঁহাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন—সেই বিশ্বাসের ফলেই বাবা তারকনাথ তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাঁহার সাধু সঙ্কল্পের সহায় হইয়াছিলেন। দৈব-শক্তিপ্রভাবে মানব কি না করিতে পারে? ভক্তির পারমার্থিক শক্তিতে দুর্ব্বল যদুনাথ ৩২৲ টাকা মাত্র লইয়া পদব্রজে দূর তীর্থ-যাত্রা করিলেন,—ইহা তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয়!

সন ১২৭০ সালের ১১ই ফাল্গুন মাস হইতে ১২৭৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় চারিবর্ষ কাল তিনি দূর তীর্থবাসে অতি-বাহিত করেন, সেই সময়ের দৈনন্দিন ঘটনা সমস্তই তাঁহার রোজ-নামচায় লিখিয়া গিয়াছেন, সেই রোজ-নামচাই 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামে

প্রকাশিত হইল। ইহার প্রসঙ্গ মুখবন্ধের প্রারম্ভেই বিবৃত হইয়াছে।

তীর্থ-যাত্রার উন্মুক্ত বাতাসে যদুনাথের ভক্তি, প্রেম, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং হৃদয়ের বল যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল ও হৃদয়ের দুর্ব্বল গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মহাপথের পথিক মহাপ্রাণ যতি সন্ন্যাসীর ন্যায় যদুনাথ যেরূপ অসাধারণ সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালে বিলাসী বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

প্রায় চারিবর্ষ পরে যদুনাথ ঘরে ফিরিলেন—নানা দেশ, নানা তীর্থ, নানা জাতি, নানা সমাজ ও নানা প্রকার দেশের অবস্থা দেখিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার সময় সমস্ত ভারতভূমি যেরূপ সিপাহী-বিদ্রোহের আলোড়নে আলোড়িত হইতেছিল, সাধু যদুনাথের হৃদয় আবার পারিবারিক সংসার-কোলাহলে আসিয়া সেইরূপ বিচলিত ও উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। ঘরে প্রবেশ মাত্র কনিষ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুসংবাদে তিনি সংসার বিভীষিকায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমে যে ঔদাস্য ও বৈরাগ্য লইয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, ঘরে আসিয়াই আবার সেই সংসার-বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু হৃদয়ে বৈরাগ্য চাপিয়া তাঁহাকে সংসার-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল। যদুনাথ দুঃখ করিয়া সেই সময় বলিতেন 'রাধাকান্তের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

তীর্থ হইতে ফিরিয়া যদিও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন—কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরহিতব্রতে ও সমাজ-সেবায় অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্রালোচনা, হরিনাম-স্মরণ ও হরিনাম-কীর্ত্তন তাঁহার

ধর্ম্মজীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রসন্নকুমার রাধানগরে একটী সংস্কৃত-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, নদীর ধারে পাকা দালানে সেই বিদ্যালয় ছিল। (এখন অবশ্য সেই বিদ্যাভবন নদীগর্ভ-শায়ী।) যদুনাথ যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য, এই বিদ্যালয়ের বালকদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। বলিতে কি সেই সংস্কৃত-ইংরাজী-বিদ্যালয় যদুনাথের প্রাণস্বরূপ ছিল। গ্রামস্থ বালকবৃন্দ তাঁহার প্রেরণায় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া প্রসন্নকুমারের সাহায্যে কলি-কাতার সংস্কৃত ও অন্যান্য কলেজে পড়িতে পাইতেন। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকেই তিনি আপনার মনে করিতেন। এক দণ্ড তিনি গ্রাম ছাড়িয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কেবল গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে খিদিরপুরে আসিতেন।

তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেরই খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়া, কাপড়-চোপড় এবং বসবাস একই ধরণে হইত। বহুসংখ্যক নিরাশ্রয় আত্মীয় ও ভিন্ন জাতীয় লোক যদুনাথের ও তৎপুত্রগণের আশ্রয় পাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জেলার হাকিম পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

তাঁহার সুযোগ্য বংশধর আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন—"স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মনীষি-গণ যদুনাথের সহিত সদালাপের জন্য রাধানগর গ্রামে সর্ব্বদা যাই-তেন। দীর্ঘ তীর্থ-যাত্রা সাঙ্গ করিয়া যদুনাথ গ্রামের কোণে যে

আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা ছাড়িতে চাহিতেন না। কেবল পিতৃপক্ষে তর্পণ করিবার উপলক্ষে পনের দিনের জন্য নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেন এবং তর্পণান্তে গ্রামবাসী ও আত্মীয়গণের পূজার কাপড় নৌকা বোঝাই করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেন। নৌকার মাঝী ছেলেদের 'প্রেমচাঁদ কাকা', তন্তুবায় পরমেশ্বর তাঁতী ছেলেদের 'পরমে কাকা'; কৈলাসে হাড়ি ছেলেদের 'কৈলাস কাকা'—পল্লীজীবন তখন এমনই সুমধুর ছিল এবং ছেলেরাও যেমন পূজার কাপড় পাইত, 'পরমে কাকা' 'কৈলাস কাকা' ও 'প্রেমচাঁদ কাকা'ও তাই পাইতেন।

"তখন রাধানগরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় নাই। প্রসন্নকুমার ও সূর্য্যকুমারের বন্ধুগণ স্বাস্থ্য-অনুরোধে ও বেড়াইবার জন্য সখ করিয়া রাধানগরে গিয়া আনন্দে সময় অতিবাহন করিতেন।

যদুনাথের কুটুম্ববাড়ীর জিনিস বাড়ীর ভিতর বড় যাইতে পারিত না। রাধাকান্তের ভোগ দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত ব্রাহ্মণ-সজ্জনসেবায় স্বহস্তে বিতরণ করিয়া তিনি অপার তৃপ্তি লাভ করিতেন।

অম্বলের পীড়ায় ও শেষ বয়সে নানা রোগে যদুনাথ নিতান্ত কষ্ট পান। দিনে দুই বার স্নান করিতেন, পান ও তামাক বেশী খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল; অন্য কোন বিলাসিতার তিনি বশবর্ত্তী ছিলেন না।"

১৮৭১ সালে ঝুলান-পূর্ণিমায় দিবস যদুনাথের দেহান্ত হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধে এত ধুমধাম হইয়াছিল যে, ও অঞ্চলে এত ধুমের শ্রাদ্ধ হয় নাই বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বাধিকারী-বংশ চিরদিন সাহিত্যানুরাগী।

কেবল মুন্সী রামনারায়ণ বলিয়া নহে, যদুনাথের এক খুল্লতাত বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া পদ্যে "ধ্রুবচরিত্র" রচনা করেন। যদুনাথও অল্প বয়স হইতেই গান রচনা করিতে ভাল বাসিতেন। সে কালে প্রতি সম্ভ্রান্ত পরিবারেই সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ছিল, সকলেই কিছু না কিছু সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমাদের যদুনাথও বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যৌবন-বৃদ্ধির সঙ্গে তিনি একজন উপযুক্ত সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণবিষয়ক ও শ্যামাবিষয়ক অনেক সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি "সঙ্গীত-লহরী" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রামচাঁদ গোস্বামী, হলধর চোঙদার প্রভৃতি সংগীতজ্ঞদিগের মুখে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্বরচিত স্তব-গীতি শুনিতেন ও আপন ভুলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সঙ্গীত-লহরীর ভূমিকায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুত্র ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "রামচাঁদ গোস্বামী ও হলধর চোঙদার মহাশয় যখন তাঁহার পিতৃ-রচিত সঙ্গীতের আলাপ করিতেন, বাস্তবিক যেন কর্ণে পীযুষ বর্ষণ হইত।" এখানে যদুনাথের সঙ্গীত-রচনার নমুনা দিতেছি—

(১)

মিছে কেন মায়া-জালে বদ্ধরে অবোধ মন।
মৃগ-তৃষ্ণা সম সব ধন-মান পরিজন॥
ত্যজ জাতি-কুল-মান, গাও রে বিভুর গান,
ভব পার হবি যদি লওরে তাঁর শরণ।
আমার যুকতি ধর, পাপ-পথ পরিহর
ঈশ্বর-চরণোপান্তে আত্মা কর সমর্পণ॥

(২)

হরিগুণ গাও রে।

সংসারের কুবাসনা-যন্ত্রণা এড়াও রে ॥

উদয় হ'য়ে তপন, করিতেছে আয়ুঃহরণ,

এ দেহ হবে পতন সতর্কেতে রও রে।

যে পদ ভাবনা করি, ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী,

শ্মশানেতে ত্রিপুরারি যোগাসনে রয় রে ॥

হরিনাম সারাৎসার, করিতে জীব-উদ্ধার,

প্রচারিল ত্রিসংসার পাপ নাশিবারে রে।

এমন দুর্লভ নাম, জিহ্বা জপ অবিশ্রাম,

পাইবে কৈবল্যধাম যদুরে বুঝাওরে ॥

সঙ্গীত-চর্চ্চার সঙ্গে তাঁহার নিজের সখের যাত্রার দল ছিল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সন্তান লইয়া সেই সময়ে দল গঠিত হয়। রাসের সময় বা পূজার সময় সেই সখের দলের গাওনা হইত। যেখানে গাওনা হইত, তথায় পান-তামাক ব্যতীত আর কিছুই লওয়া হইত না। এই সখের যাত্রা উপলক্ষে যদুনাথ 'উষাহরণ', 'চন্দ্রকান্ত' প্রভৃতি কএকখানি নাটক বা যাত্রার পালাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উষাহরণ হইতে দুই একটী গানের নমুনা দিতেছি—

(১)

(কেন) বিরস বদন বিধুমুখী।

মলিন চন্দ্রানন চন্দ্রেতে যেমন

মৃগাঙ্ক কলঙ্ক দেখি ॥

নীলোৎপল জিনি নয়ন-যুগল
সদত তাহে কজ্জলে উজ্জ্বল
বল গো একি বল কেন ছল ছল
ঝরে ছুটী আঁখি ॥

(২)

সখি আমাতে কি আমি আছি।
ভোলানাথের কৃপাতে পেয়ে প্রাণনাথে
পুনঃ হারায়েছি ॥
স্বপ্নে ক'রে সেই নাগরের সঙ্গ
করিলাম কত রসের প্রসঙ্গ
পরে নিদ্রাভঙ্গে হ'ল রসভঙ্গ
বিচ্ছেদ-সাগরে ডুবেছি ॥

উপরে যদুনাথের যে কয়টী গান উদ্ধৃত হইল, তাহাতে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, রসজ্ঞান, ভাবুকতা, রচনা-মাধুর্য্য ও পদ-লালিত্যের অভাব নাই। তিনি একজন প্রেমিক অথচ সুরসিক পুরুষ ছিলেন।

যদুনাথ একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন অথচ চৈতন্য-সম্প্রদায়ী ছিলেন না। তিনি রাধাকান্তজীকে নিবেদন না করিয়া কোন জিনিসই গ্রহণ করিতেন না। প্রাতঃকালে অনেকে শিশুরোগী লইয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তিনি রাধাকান্তজীর পূজা করিয়া বাহিরে আসিয়া সেই সকল রোগী দেখিতেন, ইষ্টদেবের চরণামৃত দিয়া সুকোমল হাত বুলাইয়া ও ফু দিয়া অনেক রোগী আরাম করিতেন। চিকিৎসকের সুব্যবস্থায় যে রোগ ভাল করিতে

পারে নাই—সাধু যদুনাথের দেবভক্তির গুণে সেরূপ অনেক রোগ অনায়াসেই সারিয়া গিয়াছে। তিনি তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শারদ-রাস বা কোজাগরী পূর্ণিমায় তাঁহার রাধা-কান্তের স্বতন্ত্র রাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাধাকান্তের :উপর তাঁহার যেমন প্রগাঢ়ভক্তি ছিল, অপর দেব-দেবীর উপরও তাঁহার ভক্তির হ্রাস দেখা যাইত না। তিনি বাবা তারকেশ্বরকে কিরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতেও আমরা তাঁহার দেব-ভক্তি ও মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাস পাইয়াছি।

দেব-দ্বিজে তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। তিনি ব্রাহ্মণাদিকে নিমন্ত্রণ করিয়া কখন তরকারী খাওয়াইতেন না। তাঁহার রাধা-কান্তজীকে যে সকল দ্রব্য ভোগ দেওয়া হইত, তাহাই তিনি ব্রাহ্মণাদি সকলকে আহার করাইতেন। রাধাকান্তজীকে ভোগ দেওয়া যাইতে পারে এরূপ জিনিসই তিনি আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট হইতে ভেট বা তত্ত্ব লইতেন—অপর কোন সামগ্রী লইতেন না। কেবল আত্মীয়-স্বজন বলিয়া নহে, খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের সকলেই তাঁহাকে ভয়-ভক্তি করিত। তিনি নিজে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতেন, বিপদে-আপদে সহানুভূতি দেখাইতেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণসমাজ পর্য্যন্ত অনেকস্থলে তাঁহার মত লইয়া একাদশী প্রভৃতির ব্যবস্থা স্থির করিতেন। বার মাস প্রাতঃস্নান, নামাবলীধারণ, নিজ হস্তে পুষ্পচয়ন ও পূজাদি করিতেন। পূজাদির পর বেলা ১টা পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগকে মুষ্টি-ভিক্ষা দিতেন। তৎপরে স্নানান্তে আত্মীয়-স্বজন যিনি আসিতেন, তাঁহাদিগকে লইয়া ২টার পর আহার করিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার

পর স্বরচিত স্তব-গীতি শুনিতেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সংসারে থাকিলেও তাঁহার আদৌ সংসারে আসক্তি ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"আমি বাগানের মালী ম্যানেজার, যা কিছু সব তাঁর, আমার বলিলেই শাস্তি পাইব।"

দেব-দ্বিজের উপর তাঁহার যেমন শ্রদ্ধাভক্তির পরিচয় পাইয়াছি, তাঁহার রাজভক্তিও সেইরূপ অচলা ছিল। গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশেই তাঁহার জন্ম। তখন বাঙ্গালার চারিদিকে অশান্তি—ডাকাচুরি লুটপাট সর্ব্বদাই হইত। ইংরাজেরা কিরূপে সেই সকল অশান্তি নিবারণ করেন, কিরূপে ইংরাজের সুশাসন-গুণে দেশে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, যদুনাথ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন—সেই সঙ্গে ইংরাজ-শাসনের প্রতি ও ইংরাজজাতির প্রতি স্বভাবতঃই তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি হইয়াছিল। সেই রাজভক্তির পরিচয় তীর্থ-ভ্রমণের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ-শাসনের যে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাহারই উপর তিনি ক্রোধ ও বিরক্তি ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তীর্থ শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের অনেক লীলাস্থল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্রোহীদিগের উপর যথেষ্ট ঘৃণা ও অবজ্ঞাই জন্মিয়াছিল। তিনি বরাবর মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছেন, 'দুর্বৃত্তেরা অত্যাচার করিয়া দেশেরই শত্রুতা করিয়াছে, ইংরাজরাজের কিছুই করিতে পারিবে না।' ইংরাজের বাহুবল, যুদ্ধকৌশল ও রাজনীতিতে তিনি প্রকৃতই বিমুগ্ধ ছিলেন।

সুখের বিষয়, যদুনাথের বংশধরগণও বিদ্যা, বিনয়, ধর্ম্ম, দেব-ভক্তি ও সচ্চরিত্রতার সহিত রাজভক্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী

হইয়াছেন। তাঁহার জেষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার, ডাক্তার সূর্য্যকুমার ও পেট্রিয়ট-সম্পাদক রাজকুমারের সুনাম কে না জানে? কেবল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের পদ বলিয়া নহে, যেমন শিক্ষা-বিভাগে প্রসন্নকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, চিকিৎ-সকদিগের মধ্যে রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং ব্যবস্থাপক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের মধ্যেও রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী সেইরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় দিবার এখানে স্থানাভাব, প্রত্যেকের পরিচয় দিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। অবশেষে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে—এক যদুনাথের বংশেই আমরা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ে পাঁচজন সদস্য বা ফেলো পাই-য়াছি—পূর্ব্ব সদস্য প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথা বলিতেছি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, রায় বাহাদুর রাজ-কুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার সূর্য্যকুমারের পুত্র মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী C. I. E, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী C. I. E. এই পাঁচজনের কথা বলিতেছি। এক বংশে পাঁচ জন 'ফেলো' বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কখনও কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানি না। ইহাতে যদুনাথের পুণ্য প্রতিষ্ঠার পরিচয় সূচিত হইতেছে।

গ্রন্থকারের রোজনামচা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে (একখানি বাঁধা খাতায়) দৈনন্দিন ঘটনা বা রোজ-নামচা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। গ্রন্থকারের বংশধরেরা সেই

রোজনামচার খাতাখানি পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া মলাটের উপর স্বর্ণাক্ষরে "তীর্থভ্রমণ" নাম বসাইয়া রাখেন, তদনুসারে এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক গ্রন্থকার নিজে কোন নাম দিয়া যান নাই। তিনি যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বরচিত আদর্শ অনুসারে সেই ভাষাই অবিকৃত রাখা হইয়াছে। কেবল সাধারণের পাঠের সুবিধার জন্য পদ-চ্ছেদ ও বিরাম-চিহ্ন এবং যেখানে যেখানে অস্পষ্ট বা কীটদষ্ট বোধ হইয়াছে সেই সেই উহ্য অংশ বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

তীর্থ-ভ্রমণ

সূচনা

তীর্থ-যাত্রার সময়

সন ১২৬০ সালের ১১ ফাল্গুনে তীর্থযাত্রার দিন স্থির করিয়া উক্ত দিবসে প্রাতে রাধানগরের বাটীতে তীর্থ-গমনের শ্রাদ্ধাদি ও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভোজন করাইয়া যথানিয়মানুসারে সংযত থাকিয়া উষাকালে বাটী হইতে রাধাবল্লভপুরে গোরাচাঁদ কওড়ির বাটীতে পহুছা হইল। তেঁহ সন ১২৫৭ সালে পূর্ব্বে যাত্রী লইয়া ৺গয়া গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কওড়িকে সমভ্যার করিয়া আমি ও শ্রীনকুড়চন্দ্র বসু ও শ্রীরামধন সিংহ এবং সমভ্যারি মুটে বিশ্বনাথ তাঁতি এই কয়েকজনা রাধানগরের বাটী হইতে রওয়ানা হওয়া হয়, এত কালবিলম্ব এবং ... ... গণের সমভ্যার ছাড়িবার কারণ আমি কলিকাতা হইতে গয়াধামে গমনের মানসে ৫ ফাল্গুন বাটী পহুছিয়া ১২ ফাল্গুন যাত্রা করিবার মানস ছিল। ... ইতিমধ্যে আমার ... পানিবসন্ত হয়। আমি তীর্থগমনোদ্যোগে গাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদনে তিন দিবস গোপন রাখিয়াছিলাম। আমার তৃতীয়া পিসির কন্যা ৺রামমণি কিঞ্চিৎ

সোপান জানিয়া তৎকালে গমনে ব্যাঘাত করিল। পরে বসন্তের চিকিৎসক গৌরাঙ্গপুরনিবাসী পরীক্ষিত কুমারকে আনাইয়া শীঘ্র উপশমের চিকিৎসা করাইয়া গমন করা হয়। তজ্জন্য সকলের সঙ্গছাড়া হইয়া গমন করিতে হইল। কয়েকজনে গমন করিতে করিতে ডুমরি-চটীতে বিশ্বনাথ তাঁতির ব্যামোহ আরম্ভ হইয়া পথিমধ্যে তিন চারিবার ভেদ হয়। তাহার মোটে যে সকল দ্রব্য ছিল, তাহা সকলে বিভাগ করিয়া লওয়া হইল। বহুকষ্টে বগোদরের চটীতে পহুছা হয়। তথায় অতিশয় ব্যামোহের বৃদ্ধি হয়। এজন্য এক দিবস থাকা হইল। ঐ দিবসের রাত্রে বিশ্বনাথের মৃত্যু হইল। পথিমধ্যে এত বিপদ হইল, তাহাতে ঈশ্বর কণ্ডড়ি অনেক শ্রম করিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবা করেন। পরে মৃত্যু হইলে দারগার নিকট যাওয়া … … তথাকার … … … টাদি করাইয়া দাহাদি করিতে … … … মুটে অভাবে দ্রব্যাদি কতক ঐ … … … … … … বাঁধে মুদির বাটীতে রাখি … … … কি প্রয়োজনীয় জিনিস সকলে … … … কিছু লইয়া গয়া গমন হইল। ঈশ্বরচন্দ্র কণ্ডড়ির এই সকল গুণে মনে মনে ছিল দূরদেশগমনে এমত লোক সমভ্যারে থাকিলে ভাল হয়। পরে গয়াধামে পহুছিয়া গোমাটার কণ্ডড়ির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তথাকার কর্ম্মকার্য্য সমাপন করিয়া ১৯ চৈত্র স্বদেশ যাত্রা করা হইল। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত রামধন সিংহের ব্যামোহ হয়। তাঁহাকে ডুলি করিয়া বাটী পহুছা হইল।

তীর্থ-যাত্রার পূর্ব্ব ঘটনা

সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাহাতে আমার অম্বলের ব্যামোহ হইয়া শূল উপস্থিত হইল, শূলব্যাধির যেমত যাতনা তাহার কিছু ন্যূন ছিল না। এক এক দিবস যাতনাতে এমত মনে হইত যে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। ভগবৎস্বেচ্ছায় নিবারণ হইত। ক্রমে ক্রমে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল এবং আহার রহিত হইল। এক রাত্রে ঘরে শয়নে ছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া বেদনার সূত্র হইতে উঠিয়া এক গেলাস জল পান করিলাম, তাহাতে নিবৃত্তি না পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় যাতনা হইতে লাগিল। সে যাতনার কথা যখন মনে হয়, তখনি প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। হে ভগবান্! তেমন যাতনা যেন কাহার না হয়। সেই যাতনাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ব্যাকুল হই। গৃহমধ্যে আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রগণ লইয়া শয্যান্তরে শয়নে ছিল। আমি তিন চারি বার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, তাহাতে রোগযন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়া অত্যন্ত রাগের বৃদ্ধি হইয়া আর কাহাকে কিছু না কহিয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলি বৃথা, 'সম্বন্ধ জীবনাবধি' এই মনে স্থির করিয়া চণ্ডালগ্রস্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ প্রধানকল্প বিবেচনা করিয়া ঘর হইতে বাহির হই। বাহির বাটীতে আসিয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রী৺রাধাকান্তদেব ঠাকুরের শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিলাম। ক্ষণেককাল বসিয়া থাকিতে বেদনার কিছু শান্তিবোধ হইয়া তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তৎকালে রাত্র তৃতীয় প্রহরগত, নিদ্রাবেশে হস্ত মস্তকে দিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়ন করিয়া মনে উদয় হইতে

লাগিল যে মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারকূপনরকে ডুবিয়া কেবল আমার আমার করিয়া সৃজনকর্ত্তা জগদীশ্বরকে বিস্মিত হইয়া এত ক্লেশ পাইতে হ'তেছে। হে জগদীশ্বর! আমার শরীরে কিছু বল হইলে আমি স্ত্রীপুত্রের মায়া ছেদ করিয়া তোমার দর্শনাশে দেশভ্রমণ করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাকর্ষণ হইল। ইতিমধ্যে গ্রহের অনুভূতি গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া আমার শয্যায় দেখিল আমি তথায় নাই, এহাতে ব্যাকুলা হইয়া তারামণি প্রভৃতি দ্বারায় শ্রীমত্যা মধ্যমা মাতাঠাকুরাণীকে জাগ্রত করিয়া আমার অন্বেষণে ঠাকুরবাটীতে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়নে আছি। আমাকে ডাকিবামাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইল, মাতৃসপত্নী ঠাকুরাণী হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনের চঞ্চলতা এবং ঔদাস্যতা গেল না, নিস্তব্ধে শয্যায় উপবেশন হইলাম। পরে রাত্রপ্রভাতে গৃহকার্য্যাদি সংসারাশ্রমের যাহা নিত্য নিয়ম আছে, তাহা করিতেছি। ঔদাস্তভাবে এই মত স্বল্পদিন করিতে করিতে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণতুল্য শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী আমার অতিশয় ব্যামোহ-সংবাদে কালেজে ছুটি লইয়া বাটীতে আসিয়া সাত দিবস থাকিয়া আমাকে সমভ্যার করিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতার বহুবাজারের বাসাতে লইয়া গেলেন। তথায় নৌকারোহণে জলপথে গমন হইল। বাসায় পহুছিয়া অনেক ডাক্তারকে আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইলেন। রিশড়া-নিবাসী শ্রীযুত চন্দ্রকুমার দে বহুমত পরিশ্রম এবং যুক্তি-মতে চিকিৎসা করিয়া প্রথমে জ্বর পরিত্যাগ করাইলেন; পরে শূল-ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া অনেক উপশম করিলেন। সর্ব্বদা পদব্রজে ভ্রমণ করিবার আদেশ অতিশয়। প্রথম দিবস বহুবাজারের হৃদয়রাম

বাঁড়ুজ্যের বৈঠকখানা হইতে রাস্তার পর্য্যন্ত আসিতে এত ক্লেশ বোধ হইল যে ক্রন্দন করিলাম। পর দিবস মলঙ্গার গোলপুষ্করণীর ধারে আসিতে ঐ মত ক্লেশ। আর আর অনেক মনুষ্য প্রাতে বৈকালে ঐ পুকরণীর চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে। আমি এত দুর্ব্বল যে একবার প্রদক্ষিণ করিতে চারিদিকে চারিবার বসিয়া শ্রম দূর করিতে হয়। এই মত সপ্তাহ করিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণের ক্ষমতা এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া দিবাতে অন্ন ও রাত্রে সুজির রুটি পরিপাক হইল। ক্রমে বল ও আহারের বৃদ্ধি হইয়া প্রায় বার আনা ব্যাধির উপশম হইল, রোগের শেষ হয় নাই। এজন্ত বাটীতে আসা হয় না। ইতিমধ্যে রাধানগরনিবাসী শ্রীরাম মিত্র আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারীর শুভবিবাহের শুভ সম্বন্ধ রামসাগর-নিবাসী শ্রীযুত রামকানাই বোষের কন্যার সহিত স্থির করিয়া (ছিলেন।) ফাল্গুন মাসে ভবানীপুর মোকামে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহ দিয়া চৈত্র মাসে রাধানগরের বাটীতে আসা হয়। তাহার কারণ রৌদ্রের বৃদ্ধি হইয়া গরমি বৃদ্ধি হওয়ার জন্য তথায় থাকিতে ডাক্তারের কদাচ মত হই[illegible] এজন্ত সেবনীয় ঔষধি সকল লইয়া বাটী আসা হইল। বা[illegible] [illegible]ম হইল না, কিঞ্চিৎ অম্বলের সঞ্চারমাত্র রহিল। নিয়ম[illegible]ক্ত শয়ন ভোজন করি, তথাচ কষ্টের মেটে না। আর ঔষধি যখন সেবন করি, তখন ভাল থাকি, ঔষধি ছাড়িলে ব্যামোহ হয়, এহাতে অতিশয় চিন্তা রহিল এবং পূর্ব্ব ঔদাস্য মনে আছে। এই মতে সন ১২৬০ সালের আশ্বিন মাস হইল। শ্রী৺শারদীয়া পূজার বন্ধে সকল পুত্র বাটীতে আইল। আমার মনের চাঞ্চল্যগতি দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সর্ব্বদা কি জন্ত অন্যমন আছেন?" তাহাতে আমি কহিলাম, "আমার মানস হয় যে আমি পশ্চিমদেশ

ভ্রমণ করিয়া আসি, কিন্তু তোমার তাদৃশ কর্ম্মকার্য্য নাই এবং পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিষয় কিছু নাই। পৈতৃক জমিদারী বৃত্তিবিভব যাহা ছিল তাহা সকল লোপ হইয়াছে। নিজগ্রামে যাহা আছে, তাহার ভরসা নাই, সর্ব্বদা বন্যা-জলেতে হাজে; কেবল মুড়াগাছাতে ঠিকাজমির মধ্যে কিঞ্চিৎ আছে, তাহাতে যে মুনফা আছে, কায়ক্লেশে শ্রী৺জিউর নিজ অংশের সেবা আর বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ কয়েকটি গুছাইয়া করিলে হয়। সাংসারিক আহারাদির খরচপত্র যে বস্তু আবদ্ধ আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া না লইলে হইতে পারে না। যে সমস্ত তেজারতি আছে, তাহা আদায় করিতে না পারিলে বৃথা। পূর্ব্বকালের কিছু বাজার দেনা আছে, এ সকলের কি হয় এবং আমি দূরদেশে গমন করিলে কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছি।" তাহাতে প্রসন্নকুমার কহিল, "মহাশয়! কুথা পর্য্যন্ত গমনের মানস করিয়াছেন।" আমি কহিলাম, যে স্থানের জল বাতাস ভাল হয়। তাহাতে কহিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অক্ষম হইলে প্রয়াগতীর্থে কিছু দিন বাস হয়। একথা চন্দ্রবাবু ডাক্তার কহিয়াছেন, 'যে কিছু ব্যামোহের কসুর আছে; বিনাপদব্রজে অনেক ভ্রমণ না করিলে নির্দ্দোষ হইবে না। ইহাতে আমার মত তিন চারি বৎসর পশ্চিমদেশে কি উত্তরদেশে থাকেন। আমারও তাহাতে মত আছে।" আমি কহিলাম যে তবে আমার শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত এক্ষণে গমনের মানস। তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের কত টাকা হইলে গমন হয়?" তাহাতে হিসাব করিয়া দেখা হইল ৩২৲ টাকা হইলে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত পহুছিতে পারি, আর সংসারখরচের এবং আর সকল বিষয়ের যাহা নগদ টাকা মাসিক চাহি, তাহার কথা কহিতে প্রায়

রাত্র আড়াই প্রহর আমার শয়নাগারে নির্জ্জনে পিতাপুত্রে দুইজনে বসিয়া গত হইল। পরে একত্রে কলিকাতা গমন করা হয়। কার্ত্তিক মাসের শেষে শ্রীযুত দোলগোবিন্দ মিত্রের নিকট অবধোতমতে এক ঔষধি সেবন করা হয়। তাহাতে ঘৃত দুগ্ধ এবং কঠিন গরম দ্রব্যাদি আহার করিতে হয়। ঔষধিসেবনে এবং শ্রী৺তারকেশ্বরের তাগা নিয়মপূর্ব্বক ধারণ করাতে ব্যামোহ কিছুমাত্র ছিল না। উত্তমরূপ আরাম হইয়া তথা হইতে রাধানগরের বাটী আসিবার উদ্যোগ করিয়া পশ্চিমদেশ গমনের দিন ফাল্গুন মাহার প্রথমে হইবে কহিয়া, স্বদেশযাত্রা পৌষমাসে পদব্রজে পরীক্ষা জন্য হইল। তাহাতে অক্লেশে বাটী পহুছা হইল। বাটীতে পহুছিয়া রাধাবল্লভপুরনিবাসী শ্রীঈশ্বর কওড়িকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমার সহিত শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পার কিনা।" তেঁহ থাকিবার স্বীকার করিলেন। তাহার পর মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতাকে কহিলাম যে, আমি একবার তীর্থভ্রমণে যাইবার মানস করিতেছি। তোমরা দেনা পাওনার মফঃস্বল উৎপন্নের কাগজাত প্রস্তুত করহ। তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাইব। এই কথা ভায়াদিগকে প্রথমে কহিতে তাহাদের কোন মতে মত ছিল না যে আমি এত কাহিল শরীরে দূরদেশে গমন করি এবং বাটীতে সকলে শুনিয়া কাহার মত হয় না। বিশেষতঃ আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী পঞ্চম মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল, তাহার অতিশয় ক্রন্দনারম্ভ হইল। নানা কৌশলে এবং স্ত্রীর নিকটে শীঘ্র আসিব এই কপট বাক্যে এবং বিদেশে না গেলে এ রোগে মুক্ত হইব না এমত ভাব প্রদর্শন করিয়া নানাইল অগ্রহায়ণ দেশে আসিব, এমত কহিয়া সকলের সম্মতি করাইলাম। কিন্তু

মধ্যমা মাতা ও তৃতীয়া খুড়িঠাকুরাণী প্রভৃতি অনেকে সমভ্যারে যাইবার উদ্যোগী হইতে লাগিলেন এবং দেশস্থ অনেকেই গয়া কাশী একত্রে গমনোদ্যোগী ইহাতে অতিশয় মনানন্দ হইল। এই গমনের কথা স্থির হইলে পর প্রসন্নকুমারকে সম্বাদ পাঠাইলাম। তাহারা শ্রীপঞ্চমীর ছুটিতে সকলে বাটীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বাটীর খরচের ও শ্রী৺জিউর সেবার ও ক্রিয়াদির এবং বাজারদেনা শোধের এবং বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ভক্ষিত খরচের যেমত নিয়ম করিয়া ফর্দ্দ করিয়া ভায়াদিগের পুত্রগণের সম্মুখে দিলাম। সকলের সম্মতি হইল। মহাজনদিগের বন্দোবস্ত করিয়া পরে তীর্থযাত্রার দিন স্থির করিলাম।

প্রসন্ন প্রভৃতি কলিকাতা গমন করিয়া আমার পাথেয় খরচা জন্য ৩০ ত্রিশ টাকা আর বাটীর নিয়ম মত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ৯ ফাল্গুনে টাকা পাইয়া মাঘ মাহার খরচের সকল দেনা পরিশোধ করিয়া ফাল্গুন মাহার খরচার্থে দিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ভোজ দিয়া ২৷৹ দুই টাকা চারি আনা নিকটে রহিল। তাহা কাহাকেও না কহিয়া ১১ ফাল্গুন রাত্রে সকলের নিকট বিদায় হই। কথোপকথন করিতে করিতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী কান্দিতে লাগিল আর কহিল, "বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাব; আমাদের গর্ভধারিণী নাই। আমাকে বৎসরেক রাখিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। একণে আমি কাহার কাছে থাকিব এবং কে আমার আবদার সহ্য করিবে?" এই কহিয়া মায়ারূপী কন্যাসন্তান আমি যত মায়াচ্ছেদ করিয়াছিলাম তাহার সহস্রগুণে মায়াজড় করাইল। মায়ার মায়াবাক্যে মোহিত হইয়া চক্ষে জল আসিতে লাগিল। পাছে কেহ জানিতে পারে,

এজন্য চক্ষের জল চক্ষে সম্বরণ করিয়া কন্যাকে নানা মত বুঝাইয়া স্থির করিলাম। তাহার পর—অষ্টম পুত্র শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী আমার নিকট অষ্টপ্রহর প্রায় থাকিত, তাহার বাণী হইল, "আমি বাবার সঙ্গে যাব।" তাহাকে টাকা পয়সা দিয়া ভুলাইয়া সমভ্যারে যে সকল দ্রব্যাদি যাইবে তাহা একত্র করিয়া তিতু বাগ্দী সমভ্যারে মোট লইয়া যাইবে, তাহাকে ডাকিয়া মোট দেখাইয়া বান্ধিয়া রাখিলাম। যত লোক কহিয়াছিল যাইব কাহার গমন হইল না। রাত্রে সকলের সহিত কথোপকথনে আড়াই প্রহর অতীত হইল। পরে স্ত্রীকে নানামত প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্রন্দনের কিছু সম্বরণ করাইয়া ক্ষণমাত্র শয়ন করিতে রাত্র শেষ হইল। ঐ সময় উঠিয়া অর্থাৎ উষাকালে বাটী হইতে

তীর্থযাত্রা

শ্রী৺জিউকে প্রণাম করিয়া বৈকুণ্ঠ ব্রজ হৃদয় মজুমদার সমভ্যারে কৃষ্ণনগর যাই। শ্রীযুত হলধর চোঙদার মহাশয় সঙ্গ হইয়া কথোপকথনে রডার ধার পর্য্যন্ত সকলে ছিলেন। তথা হইতে বিদায় হইয়া তিতু মুটে যুধিষ্ঠির সর্দ্দারকে সঙ্গে করিয়া রাধাবল্লভপুরে গোরাচাঁদ কণ্ডড়ির বাটীতে উপস্থিত হইলাম। গোরাচাঁদ বাটীতে ছিল না। ভূরশুট পরগণার বামন-রাজার* বাটীতে তাঁহার ভগিনী ছিলেন,

* ভূরশুট—হাওড়া জেলার অতি প্রাচীন স্থান। এই স্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয়-শ্রেণীর শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'ভূরি' বা 'ভূরিশ্রেষ্ঠী' গাঞি হইয়াছে। মিত্রমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকে ভূরিশ্রেষ্ঠী নগরের উল্লেখ আছে। তাঁহারই কিছুকাল পরে রচিত শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলী হইতে জানা যায় যে এখানে ৯১৩ শকে পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করিতেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।) মুসলমান-শাসনকালে এখানকার

তৎসহযোগে তথাকার যাত্রী আনিবার জন্য গিয়াছিলেন। বাটীতে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বর ছিলেন। আগ্রহপূর্ব্বক বাটীতে রাখিয়া গোরাচাঁদকে সম্বাদ পাঠাইল। তাহার আসিবার অপেক্ষায় ১৬ ফাল্গুন পর্য্যন্ত রাধাবল্লভপুরে থাকা হইল।

তীর্থ-যাত্রা

প্রতিদিবস বাটী হইতে হৃদয় মজুমদার ও শ্রীযুত অমৃত নরেন্দ্র প্রভৃতি গতায়াত করিত। ১৬ ফাল্গুন সন্ধ্যাগতে গোরাচাঁদ আপন ভগিনী ও যাত্রিগণ সমভ্যারে আসিয়া পহুছেন। তাহারা ১৬ ফাল্গুন কওড়ির বাটীতে থাকে, পরদিন ১৭ ফাল্গুন আমরা সকলে ঈশ্বরকে সমভ্যারে করিয়া শ্রী৺ তীর্থযাত্রায় যাত্রা করিয়া জাহানাবাদের আড় পার কালীপুর (তথায় বাজার ইত্যাদি আছে এখান হইতে চারিক্রোশ তথায়) যাইয়া দোকানে অবস্থিতি করিয়া

কায়স্থশাসন বিলুপ্ত হয়। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই স্থান ব্রাহ্মণ অধিকারে আসে। এই ব্রাহ্মণবংশে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের "সত্যপীরের কথা" নামক ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থে তিনি এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"ভরদ্বাজ-অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদাভাবে হতকংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥"

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই এই ব্রাহ্মণ-রাজবংশের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে। এখন ভুরশুটে সেই ব্রাহ্মণরাজবংশের প্রাসাদ ও গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

আহারাদি হয়। গোরাচাঁদ গৌরহাটীর যাত্রীপক্ষে ঐ দিবস রহিলেন।

১৮ ফাল্গুন—

কালীপুর হইতে কোতলপুর ৭ ক্রোশ, এই স্থানে রাস্তার দোকানে থাকা হইল। ইহার পশ্চিমদিকে মুনসেফের কাছারি, উত্তরদিকে বাজার। এখানে অনেক মহাজন লোকের বসতি আছে। তাবৎ দ্রব্যাদি ভাল পাওয়া যায়। পানের বুরজ অনেক আছে, ভদ্রলোকের বসতি অনেক আছে, উত্তম স্থান, নগর কহা যায়, এই স্থানে স্থিতি।

১৯ ফাল্গুন—

গোরাচাঁদের অপেক্ষায় কোতলপুরে থাকা হয়। মুনসেফের কাছারির বিচার এবং হাটবাজার নগরের বসতি সকল দেখা হয়। মেঠাই ও কদমা ইত্যাদির দোকান ভাল ভাল আছে, নগর ভ্রমণ করিয়া নগরস্থ ব্যক্তিগণের সভ্য ভব্যতায় বাধ্য হইয়া সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিয়া দেখিলাম গোরচাঁদ যাত্রী লইয়া পহুছিয়াছেন।

২০ ফাল্গুন—

কোতলপুর হইতে ৪ ক্রোশ বালসী, যেখানে শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা আছেন, তেলিদিগের বাটীতে। তাঁহার সেবাপরাধে

বালসী ও লক্ষ্মীনারায়ণ

তাঁহাদিগের সকলেরই ধবল কুষ্ঠরোগ, বিশেষতঃ দেবতার দ্রব্য ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, তাহা না হইয়া সকল দ্রব্য তেলিরা লয়, দর্শন পাওয়া দুষ্কর, পয়সা লইয়া কৃত্রিম শিলা দর্শন করায়,—পূজারি যে ব্রাহ্মণ আছে

অতি দুর্বৃত্ত, এই যে অন্ত শিলা বিদেশী লোককে দেখায়। তাহা কিমতে জানা হইল? আমাদের সমভ্যারে এবং অন্য অন্য দলে যে সব যাত্রী ছিল, এহার মধ্যে যাহার যাহার দর্শন ইচ্ছা ছিল, তাহারা ঐ ঠাকুরের পুষ্করণীতে স্নান করিয়া পূজারিকে আলাহিদা পয়সা গোপনে দিয়া যথার্থ মূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে দাণ্ডাইয়া থাকিল।

তেলি সেবাইত ও পূজারি ব্রাহ্মণগণের আচরণ

পূজারি পাষণ্ড, শপথ করিয়া এমত চাতুরী করিয়া, অন্ত শিলা দর্শন গোপনে করাইল। সকলে বিশ্বাস করিয়া দর্শনান্তর স্নানজলাদি ধারণ এবং যে যাহা ভোগ দিবে, তাহা দিয়া আইল। ভোগ দ্রব্যের নিয়ম আছে। ঐ বাজারে যে ময়রা আছে তাহারা যে তৈলাভিষিক্ত মেঠাই এবং বারা নবাত করে তাহাই অতিশয় প্রিয়, কিন্তু ভোগ-দ্রব্য ময়রাদের যে কেহ হয় হাতে করিয়া লইয়া যাইবে, এই নিয়ম-মত ভোগ অন্ত দিয়া সকলে বাহিরে আইল। আমি কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকের দ্বারের নিকটে ছদ্মবেশে রহিলাম। যথায় ঐ পূজারির শ্বশুর প্রভৃতি কয়েকজনা স্ত্রীলোক তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদিগের দর্শনার্থে সমভ্যারে লইয়া বসিয়াছিল, সেই স্থানে তাহাদের সমভ্যারে রহিলাম। যে সময় তাহাদিগের দর্শন করাইল, তাহাতে যথার্থ শিলা দেখাইল, তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার যে চিহ্ন যথাশাস্ত্র তাহা দীপ্তমান, ঐ সকল লোকের সমভ্যারে দর্শন করিলাম। পরে গ্রামের বসতি দেখিলাম। তেলি চাষা ময়রা নাপিত অধিক আছে। ব্রাহ্মণ প্রায় একশত ঘর বাগুরে ও বাগদী গ্রামে আছে, লেখাপড়া কেহই উত্তম জানে না, কৃষিকর্ম্মে কালহরণ করে। কৃষিকর্ম্মে শস্যাদি এত জন্মায় যে তাহাতে সংসারযাত্রা এবং

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া ধনসঞ্চয় করে। প্রায় অনেকে রামায়ণ ইত্যাদি পাঁচালী গানের সম্প্রদায় করিয়া দেশে২ যাইয়া উপার্জ্জন করে। যৎকালে কৃষিকর্ম্ম না থাকে এ দুই কর্ম্মে অক্ষম যে ব্রাহ্মণ তেঁহ বিদেশে যাইয়া পাচককর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ধন-সঞ্চয় করে। এমতে প্রায় কেহ অন্নবস্ত্র জন্য বিব্রত নহে। এমত প্রায় এতদ্দেশের সকল স্থান। গ্রামের পশ্চিমদিকে এক পুষ্করণী আছে, স্নানবান্ধা ঘাট, শিবালয় দুই পাশে, উত্তরদিকে পুলিশের ফাঁড়িঘর, ঐ স্থানে শিবমন্দিরের দ্বারে বসিয়া জলযোগ করিয়া তথা হইতে ২ ক্রোশ পাত্রসায়ের,—বৃহৎ গ্রাম, বাজার এবং ধনাঢ্যগণ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাম্বুলি, তেলি ইত্যাদি মহাজনগণ সকল আছে। কৃষিকর্ম্মে এবং বাণিজ্য করিয়া সকলে সুখী আছে। অন্নক্লেশ প্রায় নাই, স্ত্রীপুরুষ সকলেই আপন আপন শ্রমে গুজরাণ করে। যাহার কৃষিকর্ম্মের সংযোগ নাই, তাহারা বনের কাষ্ঠ এবং পত্রে ও বঙ্কলে দিন নির্ব্বাহ করিতেছে। ভিক্ষোপযোগী কেহ নাই। এই স্থানে বাজারে থাকা হইল।

২১ ফাল্গুন—

প্রাতে পাত্রসায়ের হইতে ৫ ক্রোশ সোণামুখী গ্রাম, বনের মধ্যে, এই ছয় ক্রোশ প্রায় শালবনে বনে যাইতে হয়; হিংস্র জন্তুগণ আছে, ভল্লুকের ভয় অতিশয়।

সোণামুখী

এই সোণামুখী গ্রামে গদাধর শিরোমণির বাসস্থান। যিনি বর্দ্ধমানের রাজবাটীর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। তাহাতে ধনোপার্জ্জনের দ্বারায় অনেক অর্থসঞ্চয় এবং সোণামুখী গ্রাম ইত্যাদি তালুক করিয়া বাসস্থলকে অতি সুরম্য

রম্যস্থান করিয়া বনমধ্যে নগর বসাইয়াছেন। বাজার হাট শ্রেণীমত বসান হয়। মুনসেফের কাছারি, পুলিশের থানা এবং বাঙ্গালা, ইংরাজি ও ফারসী শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। অনেক মনুষ্যের বাস আছে। নিজ বাটীতে দেবসেবা অতিথসেবা উত্তমরূপ আছে। উত্তম এক বাগান, তাহাতে নানাফলপুষ্পে সুশোভিত, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মন্দিরাকৃতি দেবালয়,—এই মত বন মধ্যে নগর দেখিয়া ভ্রমণ করিয়া বাজারের উত্তরদিকে এক দোকানে অবস্থিতি হইল। এখানকার মুড়কি উত্তম।

২২ ফাল্গুন—

সোণামুখী হইতে বাহির হইয়া ইচলার খাল। গ্রামের অন্তে পার হইয়া মাঠের পথে ৩ ক্রোশ যাইয়া দামোদর নদীর শ্রীরামপুরের ঘাট। এই স্থানে নদীর ২ ক্রোশ পাথার, বালুকাময় ভূমি, প্রাতে ছয় দণ্ডের মধ্যে পার না হইলে, রৌদ্রে বালি গরম হইলে কোনক্রমে যাওয়া যায় না। নদীতে অতি অল্প জল, দুই পারে থাকে, মধ্যস্থলে বালির চড়া আছে। একে বালিতে চলা, তাহাতে রৌদ্র হইলে যেমত ভাব হয়। এই নদীর বালির চড়া পার হইয়া পশ্চিমপারে পঁহুছিলে শ্রীরামপুর, ঘাটের উপরে তিনখানা দোকান আছে এবং গ্রামের বসতি ও আম্রবাগান, কিছু অন্তরে পুষ্করণী ও পুষ্পোদ্যান আছে। দোকানে জলপান দ্রব্য, চাউল দাল ইত্যাদি আহারের দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। তাহার পর মেট্যা-পাহাড়ের উপর হইয়া ৪ ক্রোশ যাইতে হয়, দক্ষিণদিকে পথন্না গ্রাম থাকে, গোপালপুরের পাকারাস্তা পাওয়া যায়, যে রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে

শ্রীরামপুরের ঘাট

দিল্লী পর্য্যন্ত প্রথমে হয়। গোপালপুর বুদ্‌বুদ্ হইতে (৫) ক্রোশ, যে স্থানে পাকারাস্তা পাইলাম, তথা হইতে ১ ক্রোশ বাইয়া চটী, রাস্তার দুই ধারে দোকান সকল খোলার ঘর, পথিকগণের থাকিবার স্থান বৃহৎ বৃহৎ ঘর, সকল ঘরের ভাড়া দিতে হয় না, হাঁড়ি কাষ্ঠে পাতে এক পয়সা দিতে হয়। চাউল দাল ঐ দোকানে লইতে হয়, আর আর তরি তরকারি মৎস্য তৈল দধি দুগ্ধাদি বিক্রয় করিতে আইসে; বাসায় বসিয়া সকল পাওয়া যায় এবং ধোপা নাপিত কুমার কামার চামার ইত্যাদি সকলেরই দোকান চটীতে, আর পুলিসের চৌকি থানা আছে, অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত চটীর দোকানের ঘর। সকল ইন্দেরা কূয়া পথিকগণের জল সম্পোষ্য জন্য আছে। এই চটীতে থাকা হইল।

২৩ ফাল্গুন—

অতি প্রত্যূষে গোপালপুর হইতে রওনা হইয়া অণ্ডাল ৬ ক্রোশ, সেই চটীতে থাকা হইল। এখানেও পূর্ব্বমত চটী, অধিকন্তু রাস্তার উপরে মৎস্য তরকারীর বাজার হয়, আর রাস্তার ধারে রাস্তার খাদের খালে পুকরণীর ন্যায় জল থাকে। এই অণ্ডালে অনেক বসতি, ব্রাহ্মণ প্রায় চল্লিশ ঘর আছে। এই চটীতে* ব্রাহ্মণ দোকানদার অনেক আছে।

অণ্ডাল-চটী

* ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্-রেলওয়ের অণ্ডাল ষ্টেসন হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। সরকারী জরিপের মানচিত্রে এই স্থান অণ্ডাল-চটী নামেই চিহ্নিত।

২৪ ফাল্গুন—

অণ্ডাল হইতে ১ ক্রোশ মধুবন, বৃহৎ বন, কেবল মৌয়াগাছ, এই বনে প্রায় ১ ক্রোশ যাইতে হয়, তাহার পর ফরেদপুর ৩ ক্রোশ, এ চটী ভাঙ্গা চটী, এখানে কেহ রাত্রে থাকে না, পরে ৩ ক্রোশ যোগড়া, বৃহৎ চটী, গ্রামে অনেক ভদ্র মনুষ্যের বসতি আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ পণ্ডিতের তালুক।* চটীর যেমত নিয়ম তাহা সকল আছে। পণ্ডিত মহাশয় জিলা ২৪ পরগণায় ডিপুটি কালেক্টরি কর্ম্ম করেন। তেঁহ পথিকগণের হিতার্থে রাস্তার পূর্ব্বদিকে এক মনোহর ফুল-ফলের উদ্যান এবং তাহার মধ্যে প্রায় দশ বিঘা এক পুষ্করণী, তাহার চতুর্দ্দিকে পাথরের ঘাটবান্ধা, তাহার পশ্চিমদিকে প্রধান সদর ঘাট, ঐ ঘাটের উপরে দোতালা বৈঠক-খানা, নীচে ঘাটের চাঁদনীর ন্যায় দুই পার্শ্বে কুঠারি আছে, তাহাতে জলছত্রের গুড় ছোলা অতিথসেবার দ্রব্যাদি থাকে, তাহার সম্মুখ পশ্চিমদিকে পুষ্পোদ্যান তুলসীকানন, তাহার পশ্চিমে রাস্তার পূর্ব্ব যে গেট আছে তাহার ধারে ধারে বকুলগাছের কিয়ারি, অতি মনোহর স্থান, পুষ্করণীতে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সকল আছে, কেলি দেখিবার জন্য কিঞ্চিৎ মুড়ি ফেলিয়া দিলে তাহারা খাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রীড়া করে। নানা পুষ্প উদ্যান মধ্যে আছে, আপন আপন সময়ে সকল প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে আমোদিত করে। পণ্ডিত মহাশয়ের

মধুবন ও যোগড়া

* বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ ষ্টেসনের দুই ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে যোগড়া গ্রাম, এবং রাণীগঞ্জ ষ্টেসনের উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল মধ্যে 'বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের কয়লার খাদ' দেখা যায়।

জলছত্র অতিথসেবা আছে, বাগানের ফল ফুল যে কেহ লইতে পারে তাহাতে কোন বাধা নাই। এই দিবস এই চটীতে মহাভারত বেণের দোকানে থাকা হয়।

২৫ ফাল্গুন—

বোগড়া হইতে নিয়ামতপুর ৬ ক্রোশ, এই চটীতে বেলা ছয় দণ্ডের সময় পহুছিয়া থাকা হইল, রাত্র ছয়দণ্ড থাকিতে গমন হয়, পথিমধ্যে কিছু ভয় নাই। এক ক্রোশ অন্তরে অশ্বারোহিগণ প্রহরী নিযুক্ত আছে। পথিকগণ অধিক-

নিয়ামতপুর

রাত্র থাকিতে উঠিয়া গমন করিলে ঐ প্রহরী সমভ্যারে যাইয়া অন্ত সীমার প্রহরীদিগের নিকটে পহুছিয়া দেয়, রাত্র থাকিলে তাহারাও ঐ মত সঙ্গে যায়, যে চটীতে যে দিন থাকা হয় রাত্রে থানায় যাইয়া সনাহিয়ত* বহিতে আপন নাম, ধাম, গমনপ্রথা, গমনের স্থান, শস্ত্রাদি সমভ্যারে কি, যত মনুষ্য, যে রকমের স্ত্রীপুরুষ, বিশেষ করিয়া লিখাইয়া দিতে হয়। চৌকিদারী প্রতি মানুষের চারি কড়া কৌড়ির হিসাবে দিতে হয়।

২৬ ফাল্গুন—

নিয়ামতপুর হইতে ৩ ক্রোশ আসিয়া মেটেসিঁদরে পাহাড়, এই পাহাড়ের মাটি লাল, তাহার পশ্চিম বরাকর নদী—পূর্ব্বতীরে

* সনাহিয়ত—সনাক্ত।

মেটেসিঁদুরে পাহাড় ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি

রাজা হরিশ্চন্দ্রের* শিবস্থাপন, দুই মন্দির অতি প্রাচীন আছে, এক পূর্ব্বদ্বারী, এক উত্তরদ্বারী, দুই মন্দির কত দিনের তাহা কেহ কহিতে পারে না। এমত নির্ম্মাণ করিয়াছে অদ্যাবধি তাহার এক রতি চূণ কুথাও খসে নাই। দেখিবামাত্র নূতন বোধ হয়। তাহার পশ্চাতে এবং সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত গো ও শূকরমূর্ত্তি আছে, মন্দিরের ভিতরে যে শিব আছেন লিঙ্গরূপ। এই হরিশ্চন্দ্রকৃত স্থাপিত শিব দর্শন করিয়া বরাকর নদ পদব্রজে পার হইয়া পশ্চিমপারে যে চটী আছে তাহাতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পরে ৩ ক্রোশ নৃশেচটি। এই চটীতে থাকা হইল,—প্রায় ৪০ খানা বৃহৎ বৃহৎ ঘর আছে।

২৭ ফাল্গুন—

রাত্র চারদণ্ড থাকিতে নৃশেচটি হইতে গমন করিয়া ৭ ক্রোশ

* রাজা হরিশ্চন্দ্রশেখর—শিখরভূম বা পঞ্চকোটের এক প্রসিদ্ধ নরপতি। বর্ত্তমান বরাকর নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী জনপদ, পাঁচেট, মানভূম, সেনভূম ও সেনপাহাড়ী এক সময়ে ইঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ৺ভরত মল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" নামী বৈদ্যকুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে রাজা হরিশ্চন্দ্র সেনভূমের বৈদ্য রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মাধ-সেনকে পাহাড়খণ্ড দান করেন। এই পাহাড়খণ্ড পরে বৈদ্য সেনবংশের সময়ে সেনপাহাড়ী নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্ট ১২শ শতাব্দীতে রাজা হরিশ্চন্দ্রশেখর বিদ্যমান ছিলেন। নিয়ামতপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে শেখরবংশের প্রাচীন রাজধানী ঝড়পঞ্চকোট ৫ ক্রোশ মাত্র।